আটআনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা।

অভাগী

শ্রীজলধর সেন।

আশ্বিন, ১৩২২।

একটি কথা।

ইতঃপূর্ব্বে 'বিশুদাদা' পুস্তকে একটি কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম; আমার অক্ষমতাবশতঃ কথাটা যেমন করিয়া বলিলে হইত, তাহা বলা হয় নাই; তাই পুনরায় চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এবারেও কথাটা ঠিকমত বলা হইল কি না, বুঝিতে পারিতেছি না;—আমার ত মনে হয়, আমি কথাগুলি গোছাইয়া বলিতে পারি নাই। আমি তাই বলিয়া নিরাশ হই নাই; যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে আর একবার চেষ্টা করিব—বারবার তিনবার।

আশ্বিন, ১৩২২ } শ্রীজলধর সেন।

প্রকাশকের নিবেদন।

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে 'ছয়-পেনি-সংস্করণ'—'সাত-পেনি-সংস্করণ'—'শিলিং-সংস্করণ' প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়; কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্যের পুস্তকাবলীরই অন্যতম সংস্করণমাত্র। বাঙ্গালাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারবর্গরচিত, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এরূপ সুলভ-মূল্যে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে সে—যায়, যদি কাটতি অধিক হয় এবং মূল্যবান সংস্করণের মতই সুচারুরূপে মুদ্রিত হয়। কারণ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে। এ অবস্থায় 'আট-আনার গ্রন্থমালা' কেন চলিবে না? সেই দৃঢ়বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম; এই অপূর্ব্বপ্রকাশিত 'অভাগী' উপন্যাসখানিই এই গ্রন্থমালার প্রথমগ্রন্থরূপে বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। সুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এ উদ্যম এই প্রথম। পাঠকপাঠিকাগণের অনুগ্রহে আমাদের এই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ভাই শান্তি,

তোমারই আগ্রহে 'অভাগী' লিখিয়াছিলাম ; তাই তোমারই হাতে ইহাকে দিলাম।

তোমার **বড়দাদা**।

অভাগী

সুশীলা করযোড়ে বলিল—"মাগো, তোমার সন্তানকে কোলে লও মা!" — ২০৯ পৃষ্ঠা।
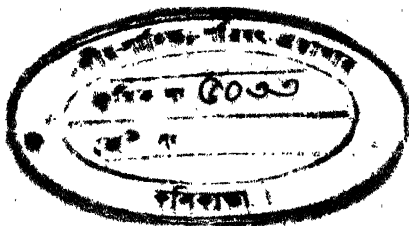
অভাগী।

[১]

দীনেশচন্দ্র রায় সতীশের বহুদিনের বন্ধু ছিল। তাহাদের উভয়ের বাড়ী একগ্রামে—হুগলীজেলার কুসুমপুরে। দীনেশ কায়স্থ, সতীশ ব্রাহ্মণ। তাহারা বাল্যকাল হইতে বন্ধু ও সহপাঠী। কুসুমপুর স্কুলে তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত একক্লাশে পড়িয়াছিল। বাৎসরিক পরীক্ষায় কোনবার দীনেশ প্রথম হইয়াছে, সতীশ দ্বিতীয় হইয়াছে; কোনবার বা সতীশ প্রথম হইয়াছে, দীনেশ দ্বিতীয় হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহারা দুইজনে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পর, কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া তাহারা এক মেসেই থাকিত, —কিন্তু এক কলেজে পড়ে নাই। দীনেশ 'জেনারল্ এসেম্বি' কলেজে পড়িতে গেল, সতীশ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইল। তাহারপর, দীনেশ এফ. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া, ময়মন্‌-সিংহ জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রামে, ততোধিক ক্ষুদ্র মাইনর স্কুলের

হেড্ মাষ্টর হইয়া গেল ; সতীশ এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতে লাগিল।

এ সময়েও, ছুটী উপলক্ষ্যে, মধ্যে মধ্যে দীনেশের সহিত সতীশের সাক্ষাৎ হইত ; কিন্তু যখন সতীশ, আইন পাশ করিয়া, পশ্চিমে সাজাহানপুরে ওকালতি করিতে গেল, তখন হইতে সে আর দীনেশের সংবাদ পাইত না। মধ্যে, সতীশ, একবার বড়দিনের ছুটিতে, ৩।৪ দিনের জন্য বাড়ীতে আসিয়াছিল ; সেই সময়ে সে শুনিল, দীনেশ কলিকাতায় এক সওদাগরী আফিসে বড় চাকরী করিতেছে। সে আর বাড়ীতে আসে না। পৈত্রিক বাড়ীতে তাহার যে অংশ ছিল, তাহা তাহার জ্ঞাতিরা দখল করিয়া লইয়াছে, সে তাহাতে দ্বিরুক্তিমাত্র করে নাই। সতীশ আরও শুনিয়াছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে দীনেশ বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার একটী কন্যা-সন্তান হইয়াছে।

তাহার পর, পনর বৎসর কেহ কাহারও কোন-সংবাদ রাখে নাই, কোন সন্ধানও পায় নাই। সতীশও দেশের মায়া একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিল—বলিতে গেলে, পশ্চিমে-বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছিল।

[২]

সতীশের প্রথমা কন্যা নীহারবালার বিবাহের সম্বন্ধ কলিকাতায় স্থির হইয়াছিল। বরপক্ষীয়েরা অতদূর, সাজাহানপুর, যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সতীশকে বাধ্য হইয়া, সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় তাহার যেসকল বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই বিবাহের আয়োজনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সতীশ পশ্চিমে থাকে; আত্মীয়-স্বজনব্যতীত কলিকাতা সহরে তাহার অধিক বন্ধু ছিলেন না। বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে, ২।৩ জন আত্মীয়ের সহিত বসিয়া, যখন সে কাহাকে-কাহাকে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিতে হইবে, তাহার একটা ফর্দ্দ করিতেছিল, সেই সময় তাহার বাল্যবন্ধু দীনেশের কথা মনে হইল। সে তখন তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে সুবোধ! শুনেছি আমাদের গ্রামের দীনেশ রায় এখানে চাকরী করে। তা'র বাসা কোথায় জানিস্? তাকেও যে একখানি নিমন্ত্রণপত্র দিতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "শুনেছি তিনি 'জন মরে কোম্পানি'র

আফিসে চাকরী করেন; কিন্তু তাঁ'র বাসা কোথায়, তা'ত জানি নে।"

সতীশ বলিল, "সে কিরে! দীনেশ আমাদের গাঁয়ের লোক, শুনেছি এখানে বড় চাকরী করে—আর তোরা তার বাসাটা পর্য্যন্ত জানিস্ নে।"

সুবোধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তিনি ত আর গাঁয়ে যান না, গাঁয়ের লোকের খোঁজ-খবরও করেন না। আমরাও সেই জন্যে গায়ে প'ড়ে আলাপ কর্ত্তে যাই না।"

সতীশ বলিল, "সে 'জন মরে কোম্পানী'র আফিসে চাকরী করে, এ কথা ত ঠিক জানিস্?"

সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই ত শুনেছি; তবে, ঠিক জানি নে।"

সতীশ বলিল, "যাক্—কা'ল, একবার 'মরে কোম্পানি'র আফিসে গিয়ে, খোঁজ নিয়ে আস্‌ব। সে আমার বাল্যবন্ধু—একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, কলেজে পড়েছি;—সে কল্‌কাতায় আছে, তা'কে নিমন্ত্রণ না-করা ঠিক হবে না।"

পরদিন, অপরাহ্ন পাঁচটার পূর্ব্বেই, সতীশ 'জন্ মরে কোম্পানী'র আফিসে যাইয়া উপস্থিত হইল। একটী বাবুর সহিত

দেখা হইলে, সতীশ তাহাকে দীনেশচন্দ্র রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে আমাদের হেড্‌ক্যাশিয়ারবাবুর নিকট নিয়ে যাচ্ছি।" তখন সতীশ জানিতে পারিল যে, দীনেশ 'মরে কোম্পানীর' হেড্‌ক্যাশিয়ার। আফিসের মধ্যে একটী স্থান অষ্টকোণ করিয়া কাঠের ও জালের বেড়া দেওয়া, তাহাতে ৩।৪ টা ক্ষুদ্র জানালার মত আছে ;—সেই অষ্টকোণ পিঞ্জরের মধ্যে 'জন মরে কোম্পানী'র হেড্‌ক্যাশিয়ার দীনেশচন্দ্র রায় উপবিষ্ট।

অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ। দীনেশ, সতীশকে প্রথমে চিনিতেই পারিল না ; সতীশ কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিল। দীনেশের বড় অপরাধ ছিল না। সতীশের আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রূরাজি এবং মস্তকবিস্তৃত ইন্দ্রলুপ্ত দেখিয়া, সে যে কুসুমপুরের ৺হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাহা চিনিয়া উঠা দীনেশের পক্ষে কঠিনই বটে।

সে সতীশের দিকে চাহিতেই, সতীশ বুঝিল সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সতীশ তখন বলিল, "কি দীনেশ, আমাকে চিনতে পার্‌ছ না? আমি সতীশ।"

এই কথা শুনিয়া দীনেশ লাফাইয়া উঠিয়া, বলিল, "হ্যালো—সতীশ, তুমি!"—এই বলিয়া, সে তাহার পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আগ্রহভরে সতীশের হাত ধরিয়া বলিল, "তারপর, তুমি কেমন আছ? বাড়ীর সব কেমন? এখানে কবে এলে? কোথায় উঠেছ? এতকাল পরে কল্‌কাতায় কি মনে করে?"

দীনেশ একেবারে ঝড়ের মত কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া গেল। সতীশ হাসিয়া বলিল, "ভায়া, আমি উকীল মানুষ; একটা একটা করিয়া প্রশ্ন কর, আমি জবাব দিই। একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন আইন-অনুসারে করা যায় না।"

দীনেশ হাসিয়া বলিল, "অন্য কথা থাক; তুমি এসে কোথায় উঠেছ?—তাই বল।"

সতীশ বলিল, "আমি, আমার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে, সপরিবারে এখানে এসেছি। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছি।"

দীনেশ বলিল, "তোমার মেয়ের বিয়ে! তোমার আবার মেয়ে কবে হ'ল? বিয়ে কবে? ছেলে কোথাকার? কি দিতে-থুতে হবে?"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, "এই দেখ, আবার একঝুড়ি প্রশ্ন আরম্ভ করলে; সে সব কথা পরে হবে। তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা ব'লে দাও; আমি, কা'ল সকালে গিয়ে, যথারীতি নিমন্ত্রণ করে আসব।"

দীনেশ বলিল, "আমার সঙ্গে ওসব শিষ্টাচার কেন? কবে বিয়ে, তাই ব'লে দাও; আমি, সপরিবারে গিয়ে, খেটেখুটে দিয়ে আসব। আর তোমার শ্যামবাজারের ঠিকানাটা দিয়ে যাও, আমি আজই আফিস-ফের্ত্তা তোমাদের ও'খান হয়ে যাব। সেখানেই সব কথাবার্ত্তা হবে। আমি সার্পেণ্টাইন লেনে থাকি। বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে গিয়ে, সার্পেণ্টাইন লেনে ঢুকেই ডাইনের দিকে প্রথম যে বাড়ীটা, সেইটেই আমার বাসা।"

সতীশ, তখন দীনেশকে তাহার ঠিকানা বলিয়া দিয়া, 'মরে কোম্পানী'র আফিস হইতে বাহির হইল।

দীনেশ সেদিন আফিসের ফেরতা সতীশের বাড়ীতে গেল না। সতীশ মনে করিল, দীনেশ হয়'ত কাজের গোলমালে আসিতে পারে নাই। পরদিন শনিবার। দুইটার সময় আফিস বন্ধ হয়; সতীশ মনে করিল, এদিন দীনেশ নিশ্চয়ই আসিবে।

সেদিনও দীনেশ আসিল না। পরদিন রবিবার; সতীশ

সার্পেণ্টাইন লেনে, দীনেশের বাসায়, যাইয়া উপস্থিত হইল। এক জন ভৃত্য বলিল, "বাবু বাড়ীতে নাই ;—বেরিয়ে গিয়েছেন।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কখন ফিরে আস্‌বেন, বলে গেছেন ?"

ভৃত্য বলিল, "তা'র কিছুই ঠিক নেই। এখনও আস্‌তে পারেন—বিকেলেও আস্‌তে পারেন—হয় ত আজ নাও আস্‌তে পারেন।"

সতীশ বলিল, "তবে কি তিনি কল্‌কাতায় নেই ?"

ভৃত্য, একটু বিরক্তিপূর্ণস্বরে, বলিল, "কল্‌কাতায় থাক্‌বেন না, ত কোথায় যাবেন ? শনিবার-রবিবার তিনি বাড়ী থাকেন না।"

সতীশ তখন, নিমন্ত্রণপত্রখানি ভৃত্যের নিকট রাখিয়া, বাসায় আসিল। বাসায় পৌঁছিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন ?"

সতীশ বলিল, "দীনেশের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম ; তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না।"

সুবোধ বলিল, "তাঁকে কি আর সবদিন পাওয়া যায় ?—বিশেষ শনি-রবিবারে।"

সতীশ বলিল, "কেন ?"

সুবোধ বলিল, "সেকথা শুনে কি কর্‌বেন ? লোকটা যেমন মাতাল, তেমনই অসচ্চরিত্র। দু'শো টাকা মাইনে পান, আর উপরিও বোধ হয় ঐ রকমই পান ; কিন্তু তাতেও তাঁর চলে না। বাড়ীতে ত থাক্‌বার মধ্যে—একটী বিধবা মেয়ে, আর স্ত্রী।"

দীনেশের এই অধঃপতনের কথা শুনিয়া, সতীশ বড়ই দুঃখিত হইল ; বলিল, "একটা মেয়ে, তাও বিধবা ! এতে কোথায় দীনেশ একেবারে মরে যাবে ; তা'না হয়ে, তার এই ব্যবহার ? আমরা যখন স্কুলে—কলেজে পড়্‌তুম্‌, তখন দীনেশ ভাল ছেলে ছিল। বোধ হয়, কল্‌কাতায় এসে, কুসঙ্গে পড়ে, আর কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে, এমন বিগ্‌ড়ে গেছে।" সতীশ তখন দীনেশের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল।

সতীশের কন্যার বিবাহের দিনও দীনেশের দেখা পাওয়া গেল না। সতীশও আর দীনেশের সঙ্গে দেখা করিতে গেল না। বিবাহের গণ্ডগোল মিটিয়া গেলে, সে সাজাহানপুর চলিয়া গেল।

[৩]

ইহার তিনমাস পরে, একদিন, সন্ধ্যার সময়, সতীশ তাহার সাজাহানপুরের বাড়ীর বৈঠকখানা-গৃহের বারান্দায় বসিয়া আছে; এমন সময় মলিনবেশধারী একটী লোক, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, হিন্দী-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি সতীশ চট্টোপাধ্যায় উকীলের বাড়ী?"

লোকটীর কথা শুনিয়াই সতীশ বুঝিল যে, সে হিন্দুস্থানী নহে, নিশ্চয়ই বাঙ্গালী। সে তখন, পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় বলিল, "হাঁ, এই সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। আপনি কি চান?"

লোকটী, কোনও উত্তর না দিয়া, বারান্দায় উঠিল। সতীশ দেখিল তাহার মস্তক মুণ্ডিত, মুখমণ্ডল কেশশূন্য। সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। লোকটীও, বারান্দায় আসিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কোন কথাও বলিল না।

সতীশ তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

লোকটী তখন, সতীশের নিকট অগ্রসর হইয়া, একবার চারিদিক চাহিয়া, অতি কাতরস্বরে বলিল, "সতীশ, আমি দীনেশ।"

সতীশ তখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দীনেশ, তুমি!"

তাহার কথায় বাধা দিয়া, দীনেশ পূর্ব্বের মত কাতর-স্বরে বলিল, "সতীশ, ভাই! আস্তে কথা বল, লোকে যেন না শোনে।"

সতীশ, কিছু বুঝিতে না পারিয়া, দীনেশের হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেল। তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "অন্য কথা-বার্ত্তা পরে হ'বে। এখন বল, তুমি কখন এলে; খাওয়াদাওয়া কিছু হ'য়েছে?"

দীনেশ বলিল, "কাল রেলে কিছু জলখাবার কিনে খেয়েছিলাম, আজ আর পয়সাও ছিল না, কিছু খাওয়াও হয় নি।"

সতীশ বলিল, "তুমি স্থির হ'য়ে বস। আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে, আগে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসি; খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হ'লে, তখন সব কথাবার্ত্তা হ'বে।"

দীনেশ তখন, সতীশের হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, "সেসব কিছু কর্‌তে হ'বে না, ভাই! আমার কথা ক'টি শোন। আমি আফিসের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ভেঙ্গেছিলাম। সাহেবেরা, এই কথা জান্‌তে পেরে, আমার নামে নালিস ক'রেছেন; আমাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌বার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হ'য়েছে। আমি পালিয়ে এখানে এসেছি। আমি ওয়ারেণ্টের আসামী; আমাকে তোমার বাড়ীতে একঘণ্টাও রাখ্‌তে সাহস করো না ভাই! আমিও সেজন্য আসি নাই। তুমি আমায় গুটিকতক টাকা দাও; আমি, আজকের রাত্রির গাড়ীতেই, আরও অনেকদূর পশ্চিমে চ'লে যাই।"

সতীশ বলিল, "কাজটা ভাল কর নি ভাই! ইংরেজের রাজ্যে কি পালিয়ে রক্ষা পাবে? তুমি যে অপরাধ করেছ, তাতে ফাঁসীও হ'ত না, দ্বীপান্তরও হ'ত না; কিছুদিনের মেয়াদ হ'ত, তার পরেই আর কোনও গোল থাকত না। আমার পরামর্শ যদি নেও, তবে এক কাজ কর; আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি কলিকাতায় ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে আদালতে হাজির হও। আমি আমার বন্ধু রমেশ দেবকে চিঠি লিখে দেব। তিনি তোমার পক্ষ-সমর্থন ক'র্‌বেন।

তাঁকে একটী পয়সাও দিতে হ'বে না। তিনি, চেষ্টা কর্‌লে, দণ্ডটা অনেক কম করিয়ে দিতে পার্‌বেন। এক বছর, কি দুবছর—এর বেশী তোমার জেল হ'বেই না। তারপর, খালাস হ'লে আর কোন গোল নেই। কিন্তু, তুমি যা কর্‌তে যাচ্ছ, তাতে যে তুমি মর্‌তে যাচ্ছ। যদি ধরা না পড়, তা হলেও ত তুমি কখনও দেশে ফির্‌তে পারবে না; চিরজীবনটা লুকিয়ে লুকিয়ে ফির্‌তে হ'বে!—তা'র চেয়ে যে মরণও ভাল। আমার কথা শোন; তুমি দেশে ফিরে যাও। তুমি যত দিন জেলে থাক্‌বে, তোমার স্ত্রীকন্যার ভরণপোষণের ভার আমি নিলাম। আমি বেশ জানি, তাঁদের হাতে একটি পয়সাও নাই। তুমি যা মাহিনা পেয়েছ, তহবিল তছ্‌রূপ করে যা নিয়েছ, সবই তুমি উড়িয়ে দিয়েছ; এ খবর আমি জানি। আমার পরামর্শমত কাজ কর; পরিণামে তোমার ভাল হ'বে। তুমি একটু বস ভাই; আগে ত চারটি খেয়ে নাও, তারপর যা-হয় ঠিক করা যাবে। রাত্রি এগারটার আগে পূর্ব্ব-পশ্চিম—কোনও দিকেরই ট্রেণ নাই।"

সতীশ তখন, বাড়ীর মধ্যে যাইয়া, দীনেশের আহারের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া, একটু পরেই বাহিরে চলিয়া

আসিল ; দেখিল, দীনেশ মাথায় হাত দিয়া, সেই একস্থানেই বসিয়া, চিন্তা করিতেছে।

সতীশ বলিল, "দীনেশ ! ভেবে কি ঠিক কর্‌লে ?"

দীনেশ বলিল, "অনেক ভেবে দেখ্‌লাম, তোমার কথাই ঠিক। আমি দেশেই ফিরে যাব ; কিন্তু দেখ ভাই, আমার স্ত্রীকন্যা যেন, দুটি অন্নের জন্য, পথে পথে ভিক্ষা না ক'রে বেড়ায় !"

সেইরাত্রেই সতীশ, দীনেশের হাতে কিছু টাকা এবং কলিকাতার পুলিশ-কোর্টের একজন উকীলের নামে এক-খানি চিঠি দিয়া, তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। দীনেশ, কলিকাতায় আসিয়া, পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করিল। যথাসময়ে, পুলিশকোর্টের বিচারে, তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল ; জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে, আর ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

[৪]

সতীশ পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে, প্রতিমাসে, দীনেশের স্ত্রী ও বিধবা কন্যার ভরণপোষণের জন্য, ৪০৲ টাকা হিসাবে পাঠাইতে লাগিল। দীনেশের স্ত্রী, পুরাতন বাসা পরিত্যাগ করিয়া, কম্বুলিয়াটোলায় একটী বাড়ীর এক অংশের দুইটী ঘর ১৪৲ টাকায় ভাড়া লইলেন। দীনেশের কারাবাসের পর, সতীশ, দীনেশের স্ত্রীকে যে পত্র লেখে, তাহাতে সে বলে যে, যতদিন দীনেশ কারামুক্ত না হয়, ততদিন, দীনেশের স্ত্রীর পক্ষে কুসুমপুরে যাইয়া আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য। অভিভাবক-শূন্য অবস্থায়, যুবতী বিধবা কন্যাকে লইয়া, একাকিনী কলিকাতায় অবস্থান করা, দীনেশের স্ত্রীর পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, পল্লীগ্রামে থাকিলে খরচ-পত্রেরও সুবিধা হইতে পারে। দীনেশের স্ত্রী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন; তিনি লিখিলেন, দেশে, তাঁহাদের ঘর-দ্বার কিছুই নাই, জ্ঞাতিগণের সহিতও তেমন সদ্ভাব নাই;—বিশেষতঃ, এতকাল কলিকাতায় থাকিবার পর, পাড়াগাঁয়ে বাস

করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক—একেবারে অসম্ভব বলিলেও হয়। ব্যয় কমের সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন, "আপনি মাসে মাসে যে ৪০৲ টাকা পাঠাইতেছেন, তত টাকার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা ১৪৲ টাকা ভাড়ায় কম্বু-লিয়াটোলায় এক ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীতে দুইটী ঘর পাইয়াছি। তাহার পর, আহারের ব্যয়—সুশীলা বিধবা, তাহার আর খরচ কি? আমার যে অদৃষ্ট, তাহাতে আমি, সধবা হইয়াও, স্বামী-সুখে বঞ্চিতা। স্বামীর মঙ্গলের জন্য, সধবার বেশ ধারণ করি মাত্র। আমার স্বামী যতদিন কারাগারে থাকিবেন, ততদিন, সুশীলার সহিত, আমিও একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেছি এবং গ্রহণ করিব। সুতরাং, আমাদের আহারের ব্যয় সামান্য। আপনি মাসে মাসে ২৫৲ টাকা, এবং মধ্যে মধ্যে ৩০৲ টাকা, পাঠাইয়া দিলেই আমাদের চলিয়া যাইবে। আপনার এই উপকার, আপনার এই অনুগ্রহ, আমরা চিরজীবন স্মরণ রাখিব। ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন।"

সতীশ কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইল না। দীনেশের স্ত্রীর পত্র পাইয়া, সে ঐ পত্রের উত্তরে যাহা লিখিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সম্মাননীয়াষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে লিখিয়াছেন, গ্রামে আপনাদের ঘরবাড়ী নাই, তাহা সত্য; কিন্তু আমি, কিছুদিন পূর্ব্বে, আমার কন্যার বিবাহের সময়, যখন বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তখন দেখিয়া আসিয়াছি যে, আপনাদের বসত-বাটীর কোন অংশই আপনাদের জ্ঞাতিরা দখল করিয়া লন নাই। সে জমি জঙ্গলপরিপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেখানে, আপনাদের বাসের জন্য, আপাততঃ খানদুই ঘর তুলিয়া, চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, লইলেই চলিতে পারে। তাহা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে এবং সে ব্যয় করিতে আমি প্রস্তুত আছি। বাড়ীতে, আমার দাদাকে পত্র লিখিয়া দিলেই, তিনি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন এবং নিজে, কলিকাতায় যাইয়া, আপনাদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন এবং সর্ব্বদা আপনাদিগের দেখাশুনার ভারও তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন।

"দ্বিতীয় কথা, বাড়ীতে জ্ঞাতিদিগের সহিত আপনাদিগের সদ্ভাব নাই। দীনেশ যখন চাকরী করিত এবং অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত, তখন, হয় ত, জ্ঞাতিদিগের সহিত তাহার সদ্ভাব

ছিল না ; কিন্তু এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পর, আপনারা বাড়ীতে গেলে কেহই আপনাদিগের সহিত অসদ্ভাব রাখিবেন না, একথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। বিশেষতঃ, দাদা যখন আপনা-দিগের সহায় হইবেন, তখন আপনাদিগের সহিত অসদ্ভাব করিতে গ্রামের কাহারও সাহস হইবে না। আপনারা কলিকাতায় অবস্থানকালে যে ২৫৲-৩০৲ টাকা খরচ করিতে চাহিতেছেন, সেই টাকায় আপনারা গ্রামে অতি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবেন—এমন কি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথাতিরিক্ত ব্যয় করিলেও, ঐ টাকা হইতে উদ্বৃত্ত থাকিবে।

"তাহার পর,—সর্ব্বশেষ কথা হইলেও—সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, কলিকাতার ন্যায় নির্ব্বান্ধবস্থানে, অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকা আপনাদিগের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত নহে। বিপদ্, আপদ্, রোগ, ব্যাধি সকলেরই আছে। আপনারা যদি কোনও বিপদে পড়েন, বা আপনাদের শরীর অসুস্থ হয়, তাহা হইলে, কলিকাতায় আপনাদের দেখিবার লোক কে আছে? এ প্রকার নিরাশ্রয় অবস্থায় কলিকাতায় বাসকরা কি কর্ত্তব্য? আপনারা, আমাকে আপনাদিগের পরমাত্মীয় মনে করিয়া থাকেন; সেইজন্যই, অতি সঙ্কোচের সহিত, আর একটি কথা বলিতেছি;—

আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না।—বিধবা যুবতী কন্যাকে লইয়া এ অবস্থায় আপনি কলিকাতায় থাকিতে সাহস করেন কিরূপে? অবশ্য, পল্লীগ্রামেও নানাপ্রকার প্রলোভন আছে; কিন্তু সহরে প্রলোভনের ভয় যত অধিক, পল্লীগ্রামে তত নহে। জানি না, দীনেশ এতকাল আপনাদিগকে কিভাবে শিক্ষিতা করিয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যদি, কন্যা লইয়া, গ্রামে গিয়া বাস করেন, এবং পাড়াগাঁয়ের সাদাসিধে ভাবে চলেন, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে, আপনাদিগের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিবে না। এই কথাগুলি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন এবং, যাহা কর্ত্তব্য স্থির করেন, আমাকে জানাইবেন,—আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিব। এই সকল কথা হইতে এমন মনে করিবেন না যে, আপনারা, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া, কলিকাতায় বাস করিলে আমার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, এবং যাহা আপনাদের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি, তাহা, আপনাদিগকে বলা কর্ত্তব্য বলিয়াই, আপনাদিগকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি—”

দীনেশের স্ত্রী, এই পত্র পাইয়াও, তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন করিলেন না;—দীনেশের কারামুক্তিকালপর্য্যন্ত, কলিকাতায় অবস্থান করাই স্থির করিলেন। সতীশ, এসম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিল না, মাসে মাসে ৩০৲ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইতে লাগিল।

[৫]

কম্বুলিয়াটোলায় হরিশচন্দ্র ঘোষ নামে একটী ভদ্রলোক বাস করেন। সদর রাস্তার উপরেই তাঁহার বাড়ী। বাড়ীখানি তিনি নির্ম্মাণ করেন নাই ; রেলি ব্রাদার্সের বাড়ীর আঠাশ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী, এত বেশী 'পান' খাইবার পয়সা পান-না যে, এই অল্প বেতন ও পানের পয়সায়, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া, কলিকাতার মত সহরে, কম্বুলিয়াটোলায় বড় রাস্তার উপরে, একখানি কোটাবাড়ী প্রস্তুত করিতে পারেন ! বাড়ীখানি হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গীয় পিতৃদেব, যেমন করিয়াই হউক, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতাই, চেষ্টা করিয়া, তাঁহাকে রেলির বাড়াতে, ১৫৲ টাকা বেতনে, নিযুক্ত করিয়া দেন। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতেই যাঁহার পাঠ শেষ হইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন হরিশ্চন্দ্রের পিতা যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তাহার আট বৎসর পরে, হরিশ্চন্দ্রের বেতন যখন ২৮৲ টাকা হইল, তখন, তাঁহার পিতা পৃথিবীর কার্য্য হইতে একেবারে অবসরগ্রহণ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র, পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে, পাইলেন—ঐ বাড়ী-

খানি ; আর পাইলেন—একপাল কুপোষ্য। হরিশ্চন্দ্রের মাতা, তাঁহার পিতার পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন ; বাড়ীতে ছিলেন—হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী, একটী পুত্র, একটী শ্যালক এবং একটী বিধবা সন্তানহীনা শ্যালিকা—তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা-ভগিনী। কেহ হয় ত বলিবেন, শ্যালক-শ্যালিকা কুপোষ্য হইতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী এবং পুত্র কোন্ আইন-অনুসারে কুপোষ্য হইল ?—এ কৈফিয়তের উত্তর এই স্থানে দিলে, আর গল্প বলা হয় না !

হরিশ্চন্দ্রের বেতন ২৮৲ টাকা ; কিন্তু খাইবার লোক পাঁচটী।—২৮৲ টাকায় এতগুলি লোকের দুবেলার অন্ন-সংস্থান এক প্রকার হইতে পারে ; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও বাজেখরচও ছিল। তাহার পর, ছেলে এবং শ্যালক-মহাশয়ের দুবেলা চা চাই। শ্যালক ও পুত্র প্রায় সাবালকের কাছে পৌঁছিয়াছে ; সুতরাং, তাঁহাদের দুই চারি পয়সার সিগারেটেরও প্রয়োজন। তাহার পর, স্বয়ং হরিশ্চন্দ্রেরও এটা, ওটা, সেটা—এটুকু, ওটুকু, সেটুকু আছে। তিনি, নানাকৌশলে, যে দুচার-পয়সা উপরি-উপার্জ্জন করেন, তাহার ব্যয়ের হিসাব তিনিও দিতে পারেন না ;

আমরা, দিতে পারিলেও, ভদ্রতা ও শ্লীলতার অনুরোধে দিব না।

শাস্ত্রে লেখা আছে, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ', অর্থাৎ, মানুষ মাতুলের ধারা অনেকটা পায়। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ, অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই, তাহার মাতুল তিনকড়ির সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিল। পিতার সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, সে, ষোল বৎসর বয়সেই, বিদ্যালয়ের পঞ্চম-শ্রেণী হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ পিতা, "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ', এই মহাবাক্যের সম্মান-রক্ষার্থ, পুত্রকে কিছু বলিলেন না; বরঞ্চ 'মিত্রবদাচরেৎ'ই করিতে লাগিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের শ্যালক, তিনকড়ি, নাকি তাহাদের গ্রামের স্কুলের তৃতীয়-শ্রেণীপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। তাহার পর, সে যখন, তাহার একমাত্র আপনার-জন, বিধবা বড়-দিদিকে সঙ্গে লইয়া, তাহার ছোট-দিদির স্কন্ধে ভর করিল এবং ভগিনীপতি, ও তস্য পিতার, উপার্জ্জনের অন্ন অম্লানবদনে ধ্বংস করিবার মৌরসী অধিকার পাইল, তখন আর অধিক পড়াশুনার প্রয়োজন অনুভব করিল না। ভগিনীপতির

অন্নে উদরপোষণ, এবং বিধবা-ভগিনীর অর্থে বাবুগিরি করিবার সুযোগলাভ করিয়া, সে পাড়ার দশজনের একজন হইয়া বসিল। তাহার জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর হাতে নগদ কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল; তাহা সে জানিত। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র তাহার মাতুলের এই উন্নত আদর্শের অনুসরণ করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হইল।

পরিচয়-প্রদানটা এইস্থানেই শেষ করিতে পারিলে ভাল হইত। আরও দুইটী কথা না বলিলে, এই গৃহস্থের পরিচয় যে একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; অতএব, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, একটী কথা বলিতে হইতেছে। হরিশ্চন্দ্রের গৃহলক্ষ্মীর একটু পরিচয় আবশ্যক। বিশেষ বাগাড়ম্বর না করিয়া, একটী কথা বলিলেই তাঁহার পরিচয় বোধ হয় সম্পূর্ণ হইবে। হরি-শ্চন্দ্রের প্রতিবেশীরা তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর 'রণচণ্ডী' নামকরণ করিয়াছিল। তাঁহার কর্কশ-কণ্ঠস্বর প্রতিবেশীদিগকে সময়ে-অসময়ে সন্ত্রস্ত করিত। হরিশ্চন্দ্র, আফিস হইতে ফিরিবার সময়, যেদিন একটু 'রং চড়াইয়া' আসিতেন, সে-রাত্রিতে প্রতিবেশীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত; সারারাত্রি ঝগড়া-গোলমাল চলিত।

আর একটী কথা, হরিশ্চন্দ্রের বাড়ীর নীচের তলার দুইটী

ঘর রাস্তার উপরে ছিল। এই দুইখানি ঘরের মধ্য দিয়া, বাড়ীর-ভিতর যাইবার পথ ছিল। হরিশ্চন্দ্রের পিতা ইহার একটী ঘর, এক স্যাকৃরাকে ভাড়া দিয়াছিলেন; স্যাকৃরা সেখানে দোকান করিত। অপর ঘরটী তাঁহার বৈঠকখানা ছিল। এখনও সেই বৈঠকখানা ঠিক আছে বটে; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র আর সেখানে বসিবার অধিকার পান না। তাঁহার শ্যালক ও পুত্র, পাড়ার সমবয়স্ক ছেলেদের লইয়া, সেই বৈঠকখানায় কন্‌সার্ট-পার্টী বসাইয়াছে। 'রণচণ্ডী'র কণ্ঠস্বরে, এবং কন্‌সার্ট-পার্টীর বেসুরো বেতালা আওয়াজে, পাড়ার লোকেরা, মধ্যে মধ্যে, পুলিশ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিবার জল্পনা করিত।

এই হরিশ্চন্দ্রের বাড়ীতে, দীনেশচন্দ্রের স্ত্রী ও তাহার যুবতী বিধবা কন্যা, মাসিক ১৪৲ টাকা ভাড়া দিতে স্বীকার করিয়া, অন্দরের দুইটী ঘর অধিকার করিয়াছেন:

[৬]

কলিকাতা সহরে, এত লোকের বাড়ী থাকিতে, দীনেশের স্ত্রী কম্বুলিয়াটোলার হরিশ্চন্দ্রের বাড়ীর ভাড়াটিয়া হইলেন কেন, তাহার বিশেষ তথ্য আমরা অবগত নহি; তবে, এইটুকু মাত্র জানি যে, দীনেশের সহিত হরিশ্চন্দ্র ঘোষের অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। হরিশ্চন্দ্র, মধ্যে মধ্যে, দীনেশের বৈঠকখানায় যাতায়াত করিতেন। বোধ হয় সেই পরিচয়সূত্রেই, হরিশ্চন্দ্র, দীনেশের স্ত্রীকে তাঁহার বাড়ীর অংশ ভাড়া দিয়াছিলেন।

দীনেশের স্ত্রী, এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া, সতীশকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে সতীশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, দীনেশের স্ত্রী একটী ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সতীশ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত, দীনেশের স্ত্রী, কলিকাতায় থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া, ভাল কাজ করিলেন না। কি জানি কেন, তাহার মনে যখন-তখনই ঘোর আশঙ্কার উদয় হইত। এমন কি, ২।৩ মাস পরে, সতীশ, এক পত্রে দীনেশের স্ত্রীকে লিখিয়াছিল যে—তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থান, সে মোটেই

সঙ্গত মনে করিতে পারিতেছে না! সে, এই পত্রে, প্রস্তাব করিয়াছিল যে—দীনেশ যতদিন কারামুক্ত না হয়, ততদিন, দীনেশের স্ত্রী, কন্যাসহ, সাজাহানপুরে থাকিলে সতীশ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সে লিখিয়াছিল, "আপনাদিগের ভরণপোষণ ও যথোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য আমি আমার বাল্যবন্ধু দীনেশের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার কথার উপর নির্ভর করিয়াই, সে নিশ্চিন্তমনে কারাগারে গমন করিয়াছে। কলিকাতায় আপনারা কি ভাবে আছেন, কি অবস্থায় থাকেন, আপনাদের সুবিধা-অসুবিধা কি হইতেছে, না-হইতেছে, এত দূর হইতে তাহা জানিবার, এবং আপনাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার, উপায় আমার নাই। মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠাইয়াই আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিতেছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। দীনেশ যতদিন কারাগারে থাকিবে, ততদিন আপনাদের শুভাশুভের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী। এদিকে আপনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কিছুতেই আমার মন উঠিতেছে না। আমি বলি যে, আপনারা এখানে আসুন। এখানে আমার পরিবারের মধ্যে আপনারা সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। আর,

যদি এখানে আমার বাড়ীতে বাস করা আপনারা অসুবিধা মনে করেন, তাহা হইলে, আমার বাড়ীর নিকটেই একটি ছোট বাড়ী আপনাদিগের জন্য ভাড়া করিয়া দিতে পারি—সেখানে আপনারা থাকিতে পারেন। মোট কথা এই যে, যতদিন দীনেশ কারামুক্ত না-হইতেছে, ততদিন, আপনাদিগকে আমি আমার সাক্ষাৎ-তত্ত্বাবধানে রাখিতে চাই। আপনি এ বিষয়ে অন্যমত করিবেন না। আপনার সম্মতিজ্ঞাপক পত্র পাইলেই, আমি আপনাদিগকে এখানে আনিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারিব।"

এই পত্রের উত্তরে দীনেশের স্ত্রী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে—সতীশের চিন্তা বা উৎকণ্ঠার বিশেষ কোনও কারণ নাই। যে হরিশবাবুর গৃহে তাঁহারা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই হরিশবাবু তাঁহাদের যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সতীশবাবু তাঁহাদিগের জন্য যতদূর করিতেছেন, সেই ঋণই তাঁহারা জীবনে শোধ করিতে পারিবেন না; সাহাজানপুরে যাইয়া সতীশবাবুকে নানাপ্রকারে বিরক্ত করা তাঁহারা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

এই পত্র পাইয়া, সতীশ বড়ই দুঃখিত হইল ; কিন্তু সে আর কি করিতে পারে! মাসে, মাসে, যথানিয়মে সে খরচের টাকা পাঠাইতে লাগিল।

[৭]

পূর্ব্বে ২।১ দিন বাদ পড়িত, এখন, প্রতিদিনই, সন্ধ্যার পর হরিশ্চন্দ্রের বাড়ীতে কন্‌সার্ট-পার্টি বসে। পাড়ার ৫।৭টী যুবক, সন্ধ্যার পর এই পার্টিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রায় সকল রকম বাদ্যযন্ত্রই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনকড়ি স্বয়ং ওস্তাদের পদ গ্রহণ করিয়াছে। সকল যন্ত্রগুলি যখন একযোগে বাজিয়া উঠে, তখন, সেটা যে কন্‌সার্টের দল, এটা কাহারও মনে হইত না; মনে হইত, সরকারী চিড়িয়াখানার সমস্তপশুপক্ষী একযোগে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে।

শুধু যন্ত্রালাপেই এই আড্ডার কার্য্য শেষ হইত না; এই কোম্পানীর মেম্বরগণ সঙ্গীতালাপও করিতেন। সে সকল সঙ্গীত, ভদ্রলোকের মজ্‌লিসে কেন, অনেক থিয়েটারেও শুনিতে পাওয়া যায় না। দলের মধ্যে, যোগেশ নামে একটী যুবক ছিল; সে, কন্‌সার্ট-পার্টিতে বেহালা বাজাইত; তাহার বেহালা-বাদ্য-নৈপুণ্য শুনিলে, স্বর্ণলতার নীলকমলের কথা মনে পড়িত। কিন্তু সঙ্গীত-বিষয়ে নীলকমলের সহিত তাহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না। ভগবান্ তাহাকে সুকণ্ঠ

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার স্থর-তাল প্রভৃতির জ্ঞান মোটেই ছিল না। সে যখন বলিত, "তোমরা চুপ কর, আমি একটা 'ইমন্ কল্যাণ' গাই ;—তখন তাহার কণ্ঠ হইতে যে স্বরলহরী বাহির হইত, তাহার সহিত 'ইমন কল্যাণের' সম্বন্ধ-নির্ণয় করা স্বয়ং তান্‌সেনের পক্ষেও অসাধ্য হইয়া উঠিত। সে গায়িত 'ও পাড়াতে দুধ যোগাতে যাই গো, আমার বেলা-হ'ল।'—তিনকড়ি দলের সর্দ্দার, সে অমনি বলিয়া উঠিত—"ও কি গাচ্ছিস্, ও কি 'ইমন্-কল্যাণ' ?—ও যে 'সিন্ধু-ভৈরবী' ! এই শোন্ 'ইমন-কল্যাণ'"—এই বলিয়া, সে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্তের দ্বারা তাল দিতে দিতে, গান ধরিত—

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?
হ'রে মুরারে, হ'রে মুরারে।"

এইভাবে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত গান হইত, বাজনা হইত, দশ ছিলিম তামাক উড়িত, ৫।৭ বাক্স সিগারেট ভস্মীভূত হইত, ৮।১০ দোনা পান খরচ হইত ; আর, সন্ধ্যার পর, যখন আসর জমিত, তখন, ৮।১০ পেয়ালা চা আমদানী হইত। পূর্ব্বে, এই চা মোড়ের মাথার গরম-চায়ের দোকান হইতে সরবরাহ হইত ; এখন, বাড়ীতেই চা প্রস্তুত হয়। 'রণচণ্ডী'র নিকট,

এই চা-প্রস্তুতসম্বন্ধে, তিনকড়ি বা সুরেন কোন সাহায্যই পাইত না ; তিনকড়ির বড়দিদিই এ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। দুইচারি দিন যাইতে না যাইতে, দীনেশের কন্যা সুশীলা এইকার্য্যে সাহায্য আরম্ভ করিল। একদিন, গরমজল ঢালিতে গিয়া, তিনকড়ির বড়দিদির হাত পুড়িয়া যায় ; সেই দিন সুশীলা বলে, "বড় মাসী ! তুমি ও সব কর কেন ? আমি ত বসেই থাকি ; আমি মামাবাবু, দাদাবাবু, আর তাঁর বন্ধুদের চা-তৈরী করে দেব—তোমাকে আর এসব ক'র্‌তে হ'বে না।"

তিনকড়ির বড়দিদি বলিল, "তোমাকে আর কষ্ট ক'র্‌তে হবে না ; তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এদিকে এস না। ওসব ছোঁড়াদের সঙ্গে কি আর তুমি পেরে উঠ্‌বে। আমি ওদের চা করে দেব।"

সুশীলা বলিল, "সে কি কথা মাসীমা ! মামা-দাদারা চা খাবেন, আর আমি কি সেইটে তৈরী করে দিতে পারি নে। দেখ্‌তে ত পাই, তুমি এই সংসারের খাটুনী খাট ; তার পর, কোথায় সন্ধ্যার পর একটু হরিনাম ক'র্‌বে, তা নয় এই চা-তৈরী !—কা'ল থেকে তুমি আর এসব ক'র্‌তে পাবে না।"

তাহার পর হইতেই, সুশীলা এই কন্‌সার্ট-পার্টির যুবকদিগের চা-তৈরী করিবার ভারগ্রহণ করিল। যে ঘরে কন্‌সার্ট-পার্টি বসিত, তাহার পার্শ্বের ঘরেই কেরোসিন-ষ্টোভ এবং চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম সজ্জিত থাকিত। বৈঠকখানা হইতে এই ঘরে আসিবার একটী দ্বার ছিল। পূর্ব্বে সে দ্বার অবরুদ্ধই থাকিত; এখন, দ্বারের অপরপার্শ্বস্থ কক্ষে চায়ের কারখানা স্থাপিত হওয়ায়, দ্বার মুক্ত থাকিত—ছিট্-কাপড়ের একটী পর্দা সেই দ্বারের সম্মুখে লম্বিত হইল। সুশীলা, পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া, চা-তৈরী করিত।

প্রথম প্রথম তিনকড়ি, বা সুরেন, আসিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া যাইত। ইয়ারেরা গরম চা-পান করিত; দুগ্ধ ও চিনি তাহারা উদরস্থ করিত, আর তৎপরিবর্ত্তে তাহারা যে গরল উদ্গীর্ণ করিত, যে অশ্লীল সঙ্গীত, যে অশ্রাব্য রসিকতা—যে অবক্তব্য রহস্য-পরিহাস—তাহাদিগের আসরকে গরম করিয়া তুলিত, পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী বিধবা সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করিত; আর তাহার মনে কি হইত, তাহা আমি বুড়া মানুষ—কি করিয়া বলিব! সুশীলার মাতা মনে করিতেন, অন্ধকার গৃহে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা-অপেক্ষা,

ইহাতে তাঁহার কন্যার মন সুস্থ থাকিবে। তিনকড়ির বড়-দিদি—সুশীলার বড়মাসী—এক এক দিন নীচে আসিয়া যখন দেখিতেন যে, সুশীলা পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া আছে, তখন তিনি বলিতেন, "যাও মা, তুমি এখানে বসে আছ কেন ?—শোওগে যাও। নানারকমের ছোঁড়ারা এসে আমোদ-আহ্লাদ করে, তাতে কাণ দিতে নেই। যাও মা, ঘরে যাও।"

সুশীলা উঠিয়া ঘরে যাইত; তাহার পর, যখন তাহার বড়মাসী উপরে চলিয়া যাইত, আর এদিকে সেই সুগঠিতদেহ, সুবেশধারী, সুকণ্ঠ যুবক যোগেশ যখন গান ধরিত—

"এস এস বঁধু এস,
আমার সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন
অন্তরে ফিরে এস।--"

তখন সুশীলা আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিত, আর অতৃপ্ত-হৃদয়ে সেই গরল পান করিত। এক একবার, দ্বারবিলম্বিত পর্দ্দা ঈষৎ সরাইয়া, সেই সুন্দর যুবকের দিকে চাহিয়া থাকিত।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কন্‌সার্ট-পার্টী পূরাদমে চলিতে লাগিল; আর, একটী যুবতী বিধবা প্রলোভনের এক সোপান হইতে সোপানান্তরে নামিতে লাগিল।

[৮]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনকড়ির বড়দিদির হাতে কিছু টাকা ছিল। তিনি বিধবা, নিঃসন্তান। তাঁহার শ্বশুরকুলে দেবর, দেবরের পুত্রকন্যা প্রভৃতি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে, শ্বশুর-গৃহে আশ্রয় পাইতে পারিতেন;—শুধু আশ্রয় কেন, তাঁহার প্রকৃতি যে প্রকার মধুর ছিল, তিনি যে প্রকার ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, তাহাতে তিনি তথায় বিশেষ সম্মানের সহিতই অবস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে পিতৃমাতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়ি একেবারে ভাসিয়া যায়; এই কারণে তিনি তিনকড়ির অভিভাবিকারূপে পিত্রালয়েই বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনকড়ির পিতার যে সামান্য জমী-জমা ছিল, তাহাতেই দুইটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইত। গ্রামের মাইনর-স্কুলের পড়া শেষ হইলে তিনকড়িকে ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। তিনি তখন তিনকড়িকে লইয়া কলিকাতায় ভগিনী ও ভগিনীপতির গৃহে আসিলেন। অবশ্য হরিশ্চন্দ্রের গৃহে তাঁহাদের খোরাকী খরচ দিতে হইত না; কিন্তু তিনকড়ির কাপড়-চোপড়, স্কুলের

বেতন, জলখাবার ও অন্যান্য ব্যয়ভার তিনকড়ির বড়দিদিই বহন করিতেন। দেশের সামান্য জমীজমা হইতে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতে কলিকাতায় এই সকল খরচ সম্পূর্ণ কুলাইত না স্থতরাং তিনকড়ির বড়দিদির সঞ্চিত অর্থ হইতে প্রতি-মাসেই কিছু কিছু ব্যয় হইত।

তিনকড়ির বিদ্যা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু তিনকড়ির খরচ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাহার বড়দিদি তাহার এই অত্যধিক ব্যয়ের জন্য তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। একমাত্র ভাই, বাপ মা নাই ; তাহার আবদার তিনি সহ্য না করিলে, কে করিবে? যদি কোনদিন তিনি তিনকড়িকে বলিতেন—"দেখ্ তিনু, আমার হাতে কটিই বা টাকা আছে। তুই যদি বুঝেস্থঝে খরচ না করিস্, তাহলে পরে তোরও কষ্ট হবে, আমারও কি হবে ব'ল্তে পারি না।" তাহাতেই তিনকড়ির অভিমান হইত। সে রাগ করিয়া আহার করিত না, মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত। বড়দিদির তাহা সহ্য হইত না। তিনি তখন অনেক সাধিয়া, দু'চারি টাকা হাতে দিয়া, তাহার অভিমান ভঙ্গ করি-তেন। তাঁহার নিকট এইভাবে প্রশ্রয় পাইয়াই যে তিনকড়ির

পরকাল নষ্ট হইতেছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিমু যখন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া ইয়ারের দলে ভর্ত্তি হইল, তখন তাহার বড়দিদি মনে বড়ই বেদনা পাইলেন; কিন্তু তিনকড়িকে শাসন করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি কি একটা সামান্য কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনকড়ি রাগিয়া বলিয়াছিল—"তোমরা অমন করিয়া যদি বক, তাহ'লে হয় আমি আফিম্ খেয়ে ম'র্‌ব, আর না হয় যেদিকে দুই চোখ যাবে, সেইদিকে চলে' যাব।" এই কথা শুনিয়া তাহার বড়-দিদির বড় ভয় হইল। তিনি তাহার পর হইতে তিনকড়িকে কিছুই বলিতেন না; সে যখন যাহা চাহিত তাহাই দিতেন—এমন কি তিনকড়ির কন্‌সার্ট-পার্টীর অনেক খরচ তাঁহাকেই যোগাইতে হইত। হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী যখন তখনই বড় ভগিনীকে এইজন্য দশ কথা শুনাইয়া দিত। বড়দিদি ছোট ভগিনীর কথার যখন কর্ণপাত করিতেন না, তখন সে বলিত, "দিদি, ছোঁড়াটার মাথা খেলে।" দিদি বাধা দিয়া বলিতেন—"অমন কথা বলিস্‌নে বোন্; সাতটা নয় পাঁচটা নয়, একটা ভাই;—ঐটুকু বেঁচে থাক্‌লে তবে বাবার নাম থাক্‌বে।"

সুশীলা তিনকড়ির বড়দিদিকে বড়মাসীমা বলিয়া

ডাকিত; তিনিও সুশীলাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুশীলা-দের অবস্থার কথা সকলই তিনি শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা যে এক বন্ধুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন। সুশীলার মাকে তিনি সর্ব্বদাই আশা ভরসা দিতেন। অবসরসময়ে সুশীলাকে কাছে বসাইয়া তাহাকে রামায়ণ বা মহাভারত পড়িতে বলিতেন। সন্ধ্যার পরেও সুশীলাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন। সুশীলাও প্রথম প্রথম অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মাসীমার কাছে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত পড়িত। কিন্তু কি কুক্ষণে তিনকড়ির বড়দিদি কন্‌সার্ট-পার্টীর চা-প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন, কি কুক্ষণে তিনি সেই কার্য্যে সুশীলার সাহায্য গ্রহণ করিলেন; তখন হইতেই সব উলট্‌পালট্‌ হইয়া গেল। সুশীলা রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করা অপেক্ষা যুবকদিগের গান-বাজনা, তাহাদের হাস্য-পরিহাস, অধিক আনন্দদায়ক মনে করিতে লাগিল। যুবতী বিধবার হৃদয়ে লালসার বহ্নি ধীরেধীরে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মাতা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বুঝিয়াও বুঝিলেন না; কিন্তু

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই সুশীলার বড়মাসীমা তাহার এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। সুশীলা যে ধীরে ধীরে পাপের পথে, প্রলোভনের পথে, সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাই একদিন তিনি সুশীলাকে সাবধান করিবার জন্য তাহাকে বলিলেন —"দেখ সুশীলা, বৈঠকখানায় নানারকমের ছেলেপিলে আসে; তারা কতরকম ভাল মন্দ গান-বাজনা করে; কতরকম কথাবার্ত্তা বলে; তা'কি মেয়েদের শুন্‌তে আছে? তোমার এখন বুদ্ধি হ'য়েছে, তুমি ভাল মন্দ সবই বুঝ্‌তে পার; নিজের পোড়া-অদৃষ্টের কথাও তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ। তোমার কি ওদিকে মন দিতে আছে! মনে যদি একটু কলঙ্কের দাগ পড়ে, তা'হ'লে ত বিধবার ইহকাল পরকাল সব গেল; তাহ'লে যে নরকেও স্থান হবে না। ছি! মা, তুমি আর বৈঠকখানার দিকে যেও না। আমি ওদের ব'লে দেব, ওরা আগের মত দোকান থেকেই চা কিনে এনে খাবে; আমরা আর চা তৈরী ক'রে দিতে পারব না; তার জন্য যে দু'চার পয়সা বেশী লাগ্‌বে, তা আমিই দেব। তুমি আর ওদের চা তৈরী ক'রে দিও না। সন্ধ্যে লাগ্‌লেই উপরে

আমার ঘরে যাবে, আর আগের মত রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ক'র্‌বে।"

সুশীলা মস্তক নত করিয়া তাহার বড়-মাসীমার কথাগুলি শুনিল। সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী বিধবা এই উপদেশ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, এ কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে পরের দিন হইতে বাড়ীতে চা-প্রস্তুত হওয়া বন্ধ হইল।

সুশীলা দুই তিন দিন বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরে যায় নাই এবং উপরে তাহার মাসীমার ঘরেও যায় নাই। সন্ধ্যার পরেই তাহাদের ঘরের মধ্যে বিছানায় সে শুইয়া পড়িত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার ঘুম হইত না—সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিত।

[৯]

সাজাহানপুর হইতে সতীশ প্রতিমাসেই সুশীলাদের খরচ পাঠাইয়া দেয়। অন্য সময়ে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সুশীলাদের কথা তাহার মনে হয় না। কিন্তু মাসের প্রথমে সে যখন তাহাদের নিকট টাকা পাঠাইবার জন্য মণি-অর্ডার লিখিতে বসে, তখনই তাহার মনে হয়, দীনেশের স্ত্রী-কন্যা কলিকাতায় থাকিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এক একবার তাহার মনে হইত, সে তাঁহাদিগকে সোজাসুজি লিখিয়া পাঠায় যে, তাঁহারা যদি দেশে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে না চান, অথবা সাজাহানপুরে আসিতে না চান, তাহা হইলে সে তাঁহাদিগের খরচ চালাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইত—হয় ত দীনেশের স্ত্রী মনে করিবেন 'ইহা খরচ বন্ধ করিবার একটা অজুহাত মাত্র।' এই ভাবিয়া সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিত না।

একদিন কি কারণে বলা যায় না, সতীশ মনে করিল যে, কলিকাতায় তাহার ত অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব আছে। তাহাদের কাহারও উপর দীনেশের স্ত্রী-কন্যার তত্ত্বাবধানের

ভার দিলে ত মন্দ হয় না। এমন সোজা উপায় থাকিতে সে এতদিন নানা কথা চিন্তা করিয়াছে, মনে করিয়া নিজের বুদ্ধির তারিফ করিল। সেইদিনই সে তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধকে পত্র লিখিয়া দিল যে, সে যেন প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া দীনেশের স্ত্রী-কন্যার খোঁজখবর লয়।

সতীশের পত্র পাইয়া সুবোধ তিন চারি দিন কম্বুলিয়াটোলায় যাইবার সুবিধা করিতে উঠিতে পারে নাই। শনিবার অপরাহ্ণে শ্যামবাজারে তাহার একটা প্রয়োজন ছিল। সে মনে করিল, একটু সকাল সকাল বাহির হইয়া শ্যামবাজারের কাজ শেষ করিয়া কম্বুলিয়াটোলায় যাইবে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে শ্যামবাজারে যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্যশেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন সে একবার মনে করিল, "সেদিন আর কম্বুলিয়াটোলায় যাইয়া কাজ নাই; সুবিধামত অন্য কোনদিন যাওয়া যাইবে।" আবার মনে করিল, "এই ত কম্বুলিয়াটোলা; এতদূর এসে আজ যদি ঘুরে না যাওয়া যায়, তাহ'লে আবার কবে সুবিধা হবে বলা যায় না; কাকাও হয় ত মনে ক'র্‌বেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে আমি তৎপর নই"—এই

ভাবিয়া সুবোধ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরিয়া কম্বুলিয়াটোলার দিকে চলিল। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের প্রায় তিন ভাগের উপর অতিক্রম করিয়া সে তাহার কাকার লিখিত নম্বরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে দেখিল, সেই বাড়ীর সম্মুখদিকের একটী ঘরে স্যাকরার দোকান। স্যাকরারা প্রত্যেকে একটী একটী তৈলপ্রদীপ জ্বালাইয়া কাজ করিতেছে। অপর পার্শ্বের ঘরে কতকগুলি যুবক বসিয়া গানবাজনা করিতেছে, ইয়ারকি দিতেছে। সুবোধ কিছুতেই মনে করিতে পারিল না যে, এই ক্ষুদ্র বাড়ীর ভিতরদিকে কোন ভদ্র গৃহস্থ-পরিবার বাস করিতে পারে। তখন তাহার মনে হইল, হয় ত তাহার নম্বর ভুল হইয়াছে। তাহার পকেটেই সতীশের পত্রখানি ছিল। সে অদূরবর্ত্তী রাস্তার গ্যাসের নিকট যাইয়া চিঠিখানি খুলিয়া নম্বরটি পুনরায় দেখিল। না,—নম্বর ত ভুল হয় নাই! সে আবার সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিল; মনে করিল বাড়ীটাতে একবার খোঁজ না করিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। সে স্থির করিল, যুবকদিগের নিকট সে যাইবে না। তাহারা হয় ত কথার উত্তরই দিবে না, আর না হয় ইয়ারকি করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া দিবে। তাই সে ধীরে ধীরে সেই স্যাকরার

দোকানে প্রবেশ করিয়া, ঐ বাড়ীতে দীনেশ বাবুর স্ত্রী থাকেন কি না, জিজ্ঞাসা করিল। স্যাকরাদের মধ্যে একজন মাথা তুলিয়া, বলিল "আমরা মশাই, ব'ল্তে পারি না। ঐ পাশের ঘরের বাবুদের জিজ্ঞাসা করুন—ওঁরা ব'ল্তে পারবেন। ওখানে এ বাড়ীর ছেলেরাও আছেন।"

এই কথা শুনিয়া সুবোধ স্যাকরার দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই সময়ে একটি যুবক বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সুবোধকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছেন মশাই?"

সুবোধ বলিল, "দীনেশচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ও কন্যা কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

যুবক বলিল, "হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কি আপনি দেখা করবেন?"

সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আমি এসেছি।"

যুবক বলিল, "তা'হলে আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর ভিতর ছেলেদের দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিই।"—এই বলিয়া সে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

বিদ্রূপস্বরে বলিল "ওরে তিনকড়ে, দেখে যা, তোদের সুশীলার একটি বাবু এসেছে।"

সুবোধ বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাটা শুনিল। এদিকে আড্ডাঘর হইতে তিনচারিজন বাহির হইয়া আসিয়া সুবোধকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চান মশাই?"

রাগে ও ঘৃণায় সুবোধের মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "দীনেশ রায়ের স্ত্রী ও মেয়ে কি এই বাড়ীতে আছেন? দীনেশ বাবু আমাদের গাঁয়ের লোক। এদিকে একটা বরাত ছিল; তাই মনে ক'র্‌লুম, দীনেশ বাবুর স্ত্রী ও মেয়ের খবরটা নিয়ে যাই।"

হরিশ ঘোষের ছেলে সুরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আপনি কেমন লোক মশাই; এত রাত্রিতে ভদ্রলোকের মেয়ে-দের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান। তাঁরা আপনার গাঁয়ের লোক হন, একদিন দিনের বেলায় আস্‌বেন।"

এই কথা শুনিয়া সুবোধ "আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া দ্বারের নিকট হইতে রাস্তায় নামিল।

সে সময় একটি যুবক ঠাট্টাস্বরে বলিয়া উঠিল, "সুশীলাকে আর পেয়ে কাজ নাই ; সে গুড়ে বালি !"

এই কথা শুনিয়া সুবোধের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে একাকী এই অপরিচিত স্থানে কি করিতে পারে? কাজেই তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতে হইল।

সেই রাত্রিতেই সমস্ত ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত করিয়া সে তাহার খুড়া সতীশচন্দ্রকে এক পত্র লিখিল,—সঙ্কোচে বা লজ্জায় কোন কথাই গোপন করিল না।

[১০]

এই পত্র পাইয়া সতীশচন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে বা ঘটিবার বিলম্ব নাই। সে সেইদিনই দীনেশের স্ত্রীকে এক পত্র লিখিল যে, তাঁহারা যদি এই পত্র পাঠমাত্র সাজাহানপুরে যাইবার সম্মতি জানাইয়া তাহাকে টেলিগ্রাম্ না করেন, তাহা হইলে সে শুধু যে তাঁহাদিগের খরচপত্র বন্ধ করিবে, তাহাই নহে; সে এতদিন যত টাকা দিয়াছে, তাহার জন্য নালিশ করিয়া সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবে। আর তাঁহারা যদি সাজাহানপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছেন বলিয়া টেলিগ্রাম্ করেন, তাহা হইলে সে নিজে কলিকাতায় যাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবে।

এই পত্র সুশীলার মায়ের হস্তে পৌঁছিলে, তিনি মহাচিন্তায় পড়িলেন। সতীশ যে কি কারণে এতদূর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহা তিনি মোটেই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন পত্রখানি হাতে করিয়া তিনকড়ির বড়দিদির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পত্রখানির আদ্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন।

বড়দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রকম কোন কথা তোমাদের সঙ্গে পূর্ব্বে কি হ'য়েছিল ?"

দীনেশের স্ত্রী বলিলেন, "আমার স্বামী যখন জেলে যান, সে সময় সতীশবাবু আমাদিগকে বাড়ী যাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমরা তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি আমাদিগকে সাজাহানপুরে লইয়া যাইতে চান। সে প্রস্তাবেও আমরা সম্মত হই না। তখন তিনি আমাদের কলিকাতায় থাকার প্রস্তাবে সম্মতি দেন; কিন্তু আমরা যে কলিকাতায় থাকি, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে। প্রায় প্রতিপত্রেই তিনি এ কথার আভাস দিয়া আসিতে-ছিলেন। আজকার পত্র তিনি এমন ভাবে কেন লিখিলেন, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বড়দিদি বলিলেন, "এ রকম অবস্থায়, এমন সোমত্ত বিধবা মেয়ে নিয়ে কল্‌কাতায় থাক্‌বার মত ক'রে তোমরা ভাল কাজ কর নাই। তা যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, তার জন্য ভেবে কোন লাভ নেই। এখন তোমাদের তাঁর কাছে চলে যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

সেই সময় তিনকড়ি আসিয়া সেখানে উপস্থিত

হইল। তিনকড়ি সকল কথা শুনিতে পায় নাই। শেষের কথা কয়টি তাহার কাণে গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া হবার কথা হ'চ্ছে, বড়দিদি ?"

বড়দিদি বলিলেন, "এঁর স্বামীর বন্ধু—যিনি এঁদের খরচ যোগান—তিনি এঁদের পশ্চিমে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এখানে থাকলে তিনি আর খরচ দেবেন না, ব'লেছেন।"

তিনকড়ি না ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয়া উঠিল, "এতদিন খরচ চালাচ্ছিলেন—এখন আর দেবেন না; এ নিশ্চয়ই সেই বেটার কাজ। সেই বেটাই কি মিথ্যে কথা লাগিয়েছে।"

বড়দিদি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সেই বেটা—। সেই বেটা আবার কে রে তিনকড়ি ?"

তিনকড়ি তখন রাগিয়া গিয়াছিল ; সে বলিল—"তোমরা যতই কেন বল না, এ নিশ্চয়ই সেই বেটার কাজ ?"

দীনেশের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আমরা ত কিছুই ব'লছি নে—কিন্তু সেই বেটাটা কে ?"

তিনকড়ি বলিল, "সেই বেটা আবার কে!—সে-ই ব্যাটা। শোন না, ব'লছি। আজ কয়দিন হ'ল একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় এক বেটা এসে বলে কি না, আমি দীনেশবাবুর গাঁয়ের লোক। আমি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই। শোন দিকিন্ কথাটা—বোঝ দিকিন্ আক্কেলটা! কোথাকার কে,—চিনি না শুনি না,—রাত্রি দশটার সময় বলে কি না 'ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে দেখা ক'রব'। আর কেউ হ'লে হয় ত ঘা কতক দিয়েই তাড়িয়ে দিত! সুরেন তাকে ভাল ভেবে বল্‌ল 'এত রাত্তিরে হয় ত তাঁরা ঘুমিয়েছেন; এখন তাঁদের ডাকাডাকি ক'রে তোলাটা কি ভাল হবে? তার চাইতে আপনি দয়া করে, আর একদিন সকালবেলায় আস্‌বেন, তখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'বে।' পাজী বেটা তখন, যা মুখে এল তাই বলে' গাল দিতে দিতে, রাগ ক'রে চলে গেল। আমার তখন যে রাগ হ'য়েছিল, তখনই বেটাকে ঘা-কতক বসিয়ে দিতাম; কিন্তু তখনই মনে হ'ল, হয় ত সে এঁদেরই আলাপী কেউ হবে, তাই তাকে যেতে দিলুম। সেই বেটাই নানানখানা ক'রে চিঠি লিখেছে; তাই এমন চিঠি এসেছে।"

বড়দিদি বলিলেন, "কই, এ কথা ত একদিনও আমাদের বলিস্‌নি।"

তিনকড়ি বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল, "ভারি একটা খবর কি না, তাই না ব'ল্‌লেই নয়!"

দীনেশের স্ত্রী বলিলেন, "তিনকড়ির কথাই ঠিক। গাঁয়ের কেউ ত আমাদের ভাল চক্ষে দেখে না। তাদেরই কেউ হয় ত এসেছিল—দেখা পায়নি, তাই সতীশবাবুর কাছে কতকগুলো মিথ্যে কথা লিখেছে। তিনিও সেই কথা বিশ্বাস করে, এই চিঠি লিখেছেন।"

এই কথা শুনিয়া তিনকড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, "আরে কথাটা পড়্‌তেই তিনকড়ি শর্ম্মা বুঝে নিয়েছেন। তা তোমাদের উচিত টুচিত বুঝিনে। আমার পরামর্শ যদি নাও, তাহ'লে সতীশবাবুকে সব কথা খুলে লিখে দাও। আর লিখে দাও যে, এখানে তোমরা আমাদের আপনার-জনের মত আছ; তাঁর কোনও সন্দেহ বা ভয়ের কারণ মোটেই নেই। তা যদি তিনি না শোনেন, না দিলেন খরচ! ভারি দশটা আর কুড়িটা টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন আর কি! আর তাও জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কাছে

নিয়ে যাওয়ার জন্ম তাঁর এত জিদ্ই বা কেন? আমি ত ভাল মনে করি নে। এই সব কথা শুনে আমার মনে হয়, তাঁর কোন কু-মতলব আছে; নৈলে এত জিদ্ কেন? তিনি তোমাদের আপনার জন নন। অতদূরে, পশ্চিমে তাঁর কাছে গেলে লোকে কি ব'ল্‌বে? তোমরা স্পষ্ট লিখে দাও যে, এখানে তোমরা বেশ আছ; তাঁর কোন ভয় নেই। তাতে তিনি সম্মত হয়ে টাকা পাঠান, বেশ—না পাঠান, বয়ে গেল। আমরা পার্টি থেকে চাঁদা ক'রে তোমাদের খরচ চালাব। ভারী পনের কি কুড়িটা টাকা! তার জন্যে এত!"

বড়দিদি বলিলেন, "না তিনকড়ি, তা হ'তেই পারে না। ওদের এর আগেই; হয় বাড়ীতে, না হয় তাঁর কাছে, যাওয়াই উচিত ছিল। অমন সোমত্ত মেয়ে নিয়ে একলা কল্‌কাতায় থাকা কিছুতেই ভাল হয় নি বোন! তোমরা সেখানে যাওয়ারই মত কর; তাতে তোমাদের ভাল হবে।"

দীনেশের স্ত্রী বলিলেন, "তবে তাই করা যাবে। আজই একটা 'তার' পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

তিনকড়ি বলিল, "এত তাড়াতাড়ি 'তার' পাঠাবার

দরকারটা কি? কথাটা ভাল করে, ভেবে দেখে, কাল কি পরশু 'তার' পাঠালেই হবে। দুইএক দিনের মধ্যেই ত পৃথিবী উল্টে যাচ্ছে না।" এই বলিয়া তিনকড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেইদিনই সুশীলা ও বাড়ীর আর সকলে শুনিল যে, দীনেশের স্ত্রী তাঁহার কন্যাকে লইয়া পশ্চিমে এক বন্ধুর কাছে যাইবেন। সন্ধ্যার সময় কন্‌সার্ট-পার্টীতেও এ কথাটা উঠিল। তাহার পর আরও পরামর্শ হইল। সে সকল কথা আর শুনিয়া কাজ নাই।

[১১]

সেইদিন সন্ধ্যার পর সুশীলা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, সতীশবাবু না কি আমাদের সাজাহানপুর যাবার জন্য পত্র লিখেছেন ?"

মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ পত্র পেয়েছি ; তাঁর ইচ্ছা যে, ওঁর খালাস না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁর কাছে থাকি।"

সুশীলা বলিল, "বোধ হয় মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দিতে তাঁর কষ্ট হ'চ্ছে, তাই ওকথা লিখেছেন। আমরা কি তবে দুটো ভাতের জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দাসীগিরি ক'র্‌ব ?"

মাতা বলিলেন, "যে যা করে, তা ওই দুটো ভাতের জন্যই। এ সংসারে আর আমাদের কে আছে ? এই এতদিন গেল, এক সতীশবাবু ছাড়া আর কেউ ত খোঁজও নিল না যে, আমরা মরে গেছি, কি বেঁচে আছি। এ অবস্থায় সতীশ বাবুর বাড়ী গিয়ে যদি আমাদের দাসী হয়েও থাকৃতে হয়, সেও ভাল।"

সুশীলা বলিল, "তাঁরা কি রকম লোক, তা কিছুই

জানাশোনা নাই। সতীশবাবু না হয় আমাদের দয়া ক'র্‌ছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ীর মেয়েরা যদি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করেন, আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, তা'হলে তাঁদের দেওয়া দুটো ভাত খাওয়া যে বিষ খাওয়া হবে ; সে কথা কি ভেবে দেখেছ ?"

মাতা বলিলেন, "সবই ভেবে দেখেছি সুশীলা ! অদৃষ্ট মন্দ হ'লে অনেক সইতে হয় ; আমরা কি একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। তারপর সেখানে গিয়ে হয় ত সতীশবাবুর বাড়ী নাও থাকা হ'তে পারে। প্রথম যখন তিনি আমাদের ভার নেন, তখন তিনি লিখেছিলেন যে, সাজাহানপুর গিয়ে আমরা যদি তাঁর বাসায় থাকা অসুবিধা মনে করি, তাহ'লে তিনি তাঁর বাসার কাছেই দেখেশুনে আলাদা একটা ছোট বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক করে দিতে পারেন। এখন যদি আমি সেই কথা লিখে পাঠাই, তাহ'লে তিনি হয় ত তাতেই সম্মত হবেন।"

সুশীলা বলিল, "যা ক'র্‌বে মা, তা ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে কর। আমার ত মনে হয়, সেখানে গিয়ে সতীশবাবুর বাড়ীতেই হোক, আর অন্য কোন বাড়ীতেই হোক,—আমাদের

সেখানে থাকাটাই ঠিক নয়। সেখানেও ত ভদ্রলোক আছে। তারা কি মনে ক'র্বে? তারা যদি আমাদের সম্বন্ধে কোন কুৎসাই রটনা করে, তাহ'লে যিনি আমাদের এত উপকার ক'রছেন, তাঁরও বদ্‌নাম হবে; আমাদেরও একটা মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে। আর বাবা যদি প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে আসেন, তাহ'লে ঐ সকল কথা শুনে তাঁর মনে কি হবে? তিনি তখন কি ক'র্বেন, ভেবে দেখেছ কি? সতীশবাবুকে এই সব কথা খুলে লেখ না কেন? আমার বিশ্বাস, তুমি যদি সব কথা তাঁকে খুলে লেখ, তাহ'লে তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইবেন না; এখানে তিনি যেমন খরচ দিচ্ছিলেন, সেই রকমই দেবেন। আর সে পশ্চিমদেশ—সেখানে গিয়ে আমরা থাক্‌ব কি ক'রে?"

মাতা বলিলেন, "কলঙ্কের ভয়েই ত তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, এমন অসহায় অবস্থায় তিনি আমাদের কল্‌কাতায় রাখ্‌তে পার্‌বেন না। বড়দিদিকে চিঠি দেখিয়েছি; তিনিও বল্লেন যে, আমাদের সেখানেই যাওয়া উচিত।"

সুশীলা বলিল, "তিনকড়িমামা, সুরেনদা, আরও সকলে

আজ সন্ধ্যাবেলায় আমায় ব'লছিল যে, আমাদের যাওয়া উচিত নয়। তারা ব'লছিল ভারি দশ বিশ টাকা খরচ, তার জন্য পরের দোরে দাসী হ'তে যাবে কেন? যতদিন বাবা বেরিয়ে না আসেন, ততদিন সতীশবাবু যদি খরচ না দেন, তবে তারাই আমাদের খরচ চালিয়ে নেবে।"

মাতা একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "কেন? তাদের কাছে খরচ নিতে যাব কেন? তাদের কাছে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? তাদের সঙ্গে আমাদের কোন্ পুরুষের সম্বন্ধ? বাড়ীতে আছি, ভাড়া দিচ্ছি। যেদিন উঠে চ'লে যাব, সেদিন থেকে তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকবে না। একথা তারা বললেই বা কোন্ সাহসে? আর তুমিই বা তাদের সঙ্গে কেন একথা ব'লতে গেলে? তোমার বয়স হয়েছে; ভালমন্দ বুঝতে পার; তিনকড়ি কি সুরেন না হয় বাড়ীর ছেলে, তারা না হয় দুটো কথা ব'লতে পারে; তুমিও না হয় তাদের সঙ্গে দশ কথা আলাপ ক'রতে পার। কিন্তু যাদের জানিনে, শুনিনে, চিনিনে, যারা এদের বৈঠকখানায় এসে গান-বাজনা করে, ইয়ারকি দেয়, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই বা কি? আর তাদের সঙ্গে কথা বলতেই বা যাব কেন? যে অদৃষ্ট করে এসেছ, তাতে

কোথায় বুঝেসুঝে চল্‌বে, না তোমাকে আবার উপদেশ দিতে হ'চ্ছে। সতীশবাবু যা ব'লেছেন, সেই ভাল। সেখানে গেলে যদি কেউ আমাদের কলঙ্ক করে, ভগবানের দিকে চেয়ে আমি তা মাথায় ক'রে নেব। মনে মনে ত জানব যে, আমাদের কোন অপরাধ নেই। আর ভিক্ষাই যখন ক'র্‌তে হবে,—ভিক্ষা ছাড়া পেটের জ্বালা নিবারণ কর্‌বার যখন আর উপায় নেই— যম যখন নিতেই ভুলে গিয়েছেন, তখন সতীশবাবুর মত বন্ধুর কাছেই ভিক্ষা নেব। আমি কা'লই সতীশবাবুকে আস্‌বার জন্য টেলিগ্রাম ক'রে দেব। কল্‌কাতায় আর থাক্‌ব না। হা ভগবান! অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলে।"

সুশীলার মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুশীলা কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই সুশীলার মাতা মেয়েকে বলিলেন, "রাত হ'য়ে গেল, খাবার খেয়ে শোও, সুশীলা!"

সুশীলা বলিল,—"আমি আজ আর কিছু খাব না।"

মাতা বুঝিলেন তাঁহার কর্কশ কথায় সুশীলা মনে ব্যথা পাইয়াছে। তখন তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কথায়

রাগ করো না মা! তোমার ভালর জন্যই আমি কথাগুলি ব'লেছি। এ সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কেই বা আছে? তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ছি। তোমার অদৃষ্ট মন্দ; নইলে এমন ক'রে কপাল পুড়ে যাবে কেন? আর আমাদেরই বা এ দশা হবে কেন? লক্ষ্মী মা আমার, রাগ করো না। কথাগুলো ভেবে দেখ; আমি ভাল কথাই ব'লেছি। মেয়েমানুষকে যে কত সাবধানে থাকৃতে হয়, কত ভেবেচিন্তে চল্‌তে হয়, তুমি ছেলেমানুষ, তা আর তুমি কি বুঝ্‌বে।"

সুশীলা মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বিছানায় যাইয়া শয়ন করিল। মা কত বলিলেন, কত ডাকিলেন; কিছুতেই সে উঠিল না। মা তখন দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া কন্যাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া শয়ন করিলেন। তিনিও সে রাত্রিতে জলগ্রহণ করিলেন না।

[১২]

পরদিন দশটার সময় গৃহস্বামী হরিশচন্দ্র ঘোষ যখন আফিসে বাহির হইবেন, তখন তিনকড়ির বড়দিদি তাঁহার হাতে আট আনা পয়সা ও সতীশবাবুর নাম ও ঠিকানালেখা একখানা কাগজ দিয়া বলিলেন, "তুমি আপিসে গিয়ে সতীশবাবুর নামে এই ঠিকানায় একটা 'তার' পাঠিয়ে দিও। 'তার' সুশীলার মা ক'র্‌ছেন। তাতে লিখে দিও যে, এঁরা যেতে সম্মত হ'য়েছেন; তিনি যেন এসে নিয়ে যান। কবে আস্‌বেন জান্‌তে পার্‌লে এঁরা প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন।"

ঘোষজা বলিলেন,—"এঁরা কল্‌কেতা ছেড়ে যাবেন কেন?"

বড়দিদি তখন সতীশের পত্রের কথা তাঁহাকে বলিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ ব্যবস্থা ভালই হ'য়েছে। তবে কি জান, বেশ ভাল ভাড়াটে মিলেছিল; কোন হাঙ্গাম্ হুজ্জুত ছিল না; মাস গেলে ভাড়ার টাকাটা পাওয়া যেত। এমন ভাড়াটে মেলা শক্ত হবে।"

বড়দিদি বলিলেন, "আর ভাড়াটে রেখেই বা দরকার কি? তিনকড়ি আর সুরেন বসেই আছে, তাদের কোন কাজে লাগিয়ে দাও। তারা যদি দশ কুড়ি টাকা করেও আন্‌তে পারে, তা'হলে আর ভাড়াটে রাখ্‌তে হবে না।"

ঘোষজা বলিলেন, "ওরা কি আর আমার কথা শোনে? ওরা খাচ্‌ছে দাচ্‌ছে, আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—আর মর্‌ বেটা তুই খেটে। তোমাকে ওরা একটু ভয়ও করে, আর ভক্তিও করে। তুমি ত কিছু ব'ল্‌বে না!"

বড়দিদি বলিলেন, "ওরা ছেলেমানুষ। ওদের ডেকে কে আর কাজকর্ম্ম দেবে, আর ওরাই বা কার কাছে কাজকর্ম্মের জন্য ঘুরে বেড়াবে। তুমি বড় আপিসে কাজ কর, তোমার দশজন মুরুব্বিও আছে, দশজন চেনাশোনা লোকও আছে। তুমি তাদের বলে ক'য়ে কাজ ঠিক কর, আমি ওদের দুজনকেই সম্মত করাব।"

ঘোষজা বলিলেন, "আজকাল চাকরীর বাজার যে রকম হ'য়েছে—বিশেষ এই ক'ল্‌কাতা সহরে; দুটা একটা পাশ না থাক্‌লে কেউ জিজ্ঞাসা করে না। এখন দশটাকার

একটা চাকরি খালি হলেও সতের গণ্ডা এম্, এ পাশ, বি, এ পাশ দরখাস্ত দিয়ে বসে; এখন কি আর সে দিন আছে!"

বড়দিদি বলিলেন, "ও সব তোমার বাজেকথা। রাজ্যিশুদ্ধ সব ছেলেই বি, এ পাশ, এম্ এ পাশ করে কি না! আর যারা পাশ করেনি, তারা সবই বুঝি তোমার ছেলেদের মত বসে আছে! ওদের জন্য ত আর জজ-ম্যাজিষ্টরী ক'রে দিতে বল্‌ছিনে। কায়েতের ছেলে, যাহ'ক্ দুপাতা ইংরেজী, বাঙ্গালা পড়েছেও ত; বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, এমন ত নয়। ওদের কি আর দশ পনের টাকার একটি চাকরী জুটবে না! তুমি একটু মন দিয়ে দেখ্‌লেই হয়। আর ওদের দুই মামা-ভাগ্নের চাকরীর জন্য যদি দশ বিশ টাকা খরচ কর্‌তে হয়, তাও না হয় আমিই দেব।"

ঘোষজা বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে। এখন আফিসের বেলা হল, আমি যাই।"

বড়দিদি বলিলেন, "দেখা যাবে নয়, এই মাসের মধ্যেই যা হয় একটা করে দিতে হবে, ছেলেগুলো যে বয়ে গেল।"

ঘোষজা হাসিয়া বলিলেন, "কোন আফিসের বড় বাবু ত আমায় ভায়রা নেই যে, এক মাসের মধ্যেই চাকরী জুটিয়ে দেবে।"

বড়দিদি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমার ভায়রা বেঁচে থাক্‌লে, ওরা আর তোমার মত চারপেয়ের নিকট উমেদারী কর্‌তে আস্‌ত না। দেখ, তুমি ঠাট্টা রাখ, ওদের যা হয় একটা করে দিতেই হবে! তাতে তোমারই লাভ, দেখ্‌তে পাচ্ছি ত ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না।"

ঘোষজা বলিলেন, "তা কি আর বুঝি নে! দেখি চেষ্টা করে, যা হয় একটা ক'র্‌তেই হবে।"

ঘোষজা আফিসে যাইযা প্রথমেই সতীশের নিকট তার পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়াই তিনি শুনি-লেন,—এই শনিবারেই সতীশবাবু কলিকাতায় আসিবার জন্য যাত্রা করিবেন, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় তিনি কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সোমবার প্রাতঃকালে আসিয়া দেখা করিয়া যাইবেন, এবং সেইদিন রাত্রির মেল-গাড়ীতেই সুশীলাদিগকে লইয়া যাইবেন।

সেদিন শুক্রবার। সুশীলার মাতা বড়দিদিকে বলিলেন,

এই তিন দিনের মধ্যেই আমরা সব গুছিয়ে নিতে পা'রব। জিনিষ-পত্র ত আর বেশী নেই। যা কিছু ছিল, সবই মামলা মকর্দ্দমায় গেছে।"

বড়দিদি বলিলেন, "পশ্চিমে যাচ্ছ, সেখানে ত সব জিনিষ মেলে না। যা যা দরকার, তা সবই এখান থেকেই কিনে নিয়ে যাও। টাকাকড়ি কিছু হাতে আছে ত?"

সুশীলার মা বলিলেন, "যে টাকা আস্‌ত, তার থেকে খরচপত্র ক'রে মাসে মাসে কিছু বাঁচ্‌ত। আমার হাতে এখন প্রায় সত্তর টাকা আছে।"

বড়দিদি বলিলেন, "ওরই কিছু দিয়ে যা যা দরকার, এই দুদিনের মধ্যে কিনে নাও।"

সুশীলার মা বলিলেন, "আমার আর কি দরকার দিদি! আমার দরকারের দিন ফুরিয়ে গেছে। আবার সে দিন যদি ফিরে আসে, তবে আবার দরকার হবে। এখন যা কিছু দরকার, ঐ মেয়েটার জন্যে।"

বড়দিদি বলিলেন, "তা'হলে সুশীলাকে ডেকে, সে যা যা বলে, তাই একটা ফর্দ্দ করে' লিখে নাও।"

সুশীলাকে বড়দিদি ডাকিলেন। সুশীলা বাহিরে কি

করিতেছিল—ডাক শুনিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "বড়-মাসীমা, আমাকে ডাক্‌ছিলেন।"

বড়দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকে ডাক্‌ছিলাম। সোমবার রাত্রির গাড়ীতেই ত তোমরা চলে যাচ্ছ। সে পশ্চিম দেশে ত আর সকল জিনিষ পাওয়া যায় না—আর যাও বা পাওয়া যায়, তা কল্‌কেতার মত ভালও নয়, সস্তাও নয়। তাই বল্‌ছি কি, তোমার যা যা দরকার, তার একটা ফর্দ্দ করে দাও। তিনকড়ি কি স্থরেনকে দিয়ে এই দুইদিনের মধ্যে কিনিয়ে এনে দিই। এইখানে বোস; বোসে একটা ফর্দ্দ কর।"

স্থশীলা বলিল "আমার আবার কি দরকার! কিছুরই দরকার নেই। দিন গেলে একমুঠো চাল, আর একটা কাঁচকলা হলেই আমার হ'ল; আর লজ্জা-নিবারণের জন্য এক-আধখানা কাপড়; তা ছাড়া আমার আবার কি দরকার! আমার কিছুই চাই নে। কল্‌কেতায় থাক্‌লেও আমার যা, মক্কায় গেলেও তাই।"

স্থশীলার কথা শুনিয়া তাহার মাতা বড়ই বিমর্ষ হইলেন; তাঁহার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। তিনি বড়দিদির দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, ওকে কি আমি

কোন কষ্ট এত দিন জান্‌তে দিয়েছি, ওকে কি প্রাণে ধরে বিধবার মত রেখেছি। ও যে আমার একমাত্র সন্তান! অদৃষ্টের দোষে কপাল পুড়ে গেল; তবুও আমি এতদিন ওকে বিধবার বেশে সাজাইনি; যখন যা চেয়েছে, তাই এনে দিয়েছি। তিনি যে ওকে প্রাণের অধিক ভাল বাস্‌তেন। দিদি! ওর মুখে আজ এই সব কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

বড়দিদি সুশীলাকে বলিলেন, "ছিঃ, মা সুশীলা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? দেখ দেখি, তোমার কথায় তোমার মার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। লক্ষ্মী মা আমার, ও সব কথা মুখে এনো না। যে কয় দিন তোমার মা বেঁচে আছেন, সে কয়দিন উনি যা বলেন, তাই শোন। ওঁর প্রাণে কোন রকমে ব্যথা দিও না, তারপর অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।"

সুশীলা বলিল, "আমি ত অন্যায় কথা কিছুই বলি নাই। আমি বিধবা মানুষ, আমাকে বিধবার মতই থাকৃতে হয়। এখন থেকে আমি সেই ভাবেই থাক্‌ব, এতে ত কারো কোন কথা নেই।"

বড়দিদি বলিলেন, "সুশীলা, তোমার কথাগুলি কি ভাল হ'ল? তুমি বড় হয়েছ, সবই বুঝ্‌তে পার। তারপর তোমার বাবার এই অবস্থা। এ সময় সতীশবাবুর কাছে থাকাই তোমাদের উচিত। তোমার সেখানে যেতে অনিচ্ছা, তা তোমার মায়ের কাছে আমি শুনেছি; কিন্তু এখন তা ছাড়া ত উপায় নাই। তোমার বাবা যখন খালাস হয়ে আস্‌বেন, তখন যদি ভগবান মুখ তুলে চান, তাঁর যদি আবার এখানে ভাল চাক্‌রী হয়, তখন আবার তোমরা এখানে এসো।"

সুশীলা বড়দিদির কথায় বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল, "আমি কি এখানে থাক্‌তে চাচ্ছি, না আমি সেখানে যেতে অমত কর্‌ছি। মা যা কর্‌বেন, তাই হবে।"

বড়দিদি বলিলেন, "তিনিই ত বল্‌ছেন যে, তোমার যা যা দরকার ব'লে দাও; সেগুলি কিনে আনা হোক্।"

সুশীলা ক্রোধভরে বলিল, "আমার দরকার একটা কলসী আর একগাছা দড়ি!" এই বলিয়া সুশীলা বেগে বাহির হইয়া গেল। তাহার মাতা ও বড়দিদি অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যে সুশীলা কোন দিন মাথা উঁচু করিয়া মাতার সহিত কথা বলে নাই, যে সুশীলার মুখে কেহ কখন

একটা রূঢ় কথা শোনে নাই, সেই সুশীলার আজ এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার মাতা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, বড়দিদিরও বাক্‌শক্তি লোপ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুশীলার মাতা বলিলেন, "দিদি, এখন কি করি?"

বড়দিদি বলিলেন "কি ব'ল্‌ব বোন্‌, আমার মাথার মধ্যে কোন পরামর্শ আস্‌ছে না। মেয়ের ভাব দেখে ত বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল, ওর কল্‌কাতা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নয়। কিন্তু সে ত কোন কাজের কথা নয়; সব দিক্‌ ভেবে ত কাজ কর্‌তে হবে। তবে সুশীলা ছেলেমানুষ, কল্‌কাতা ছেড়ে কখন কোথাও যায় নাই; তাই ওর মনটা কেমন হয়েছে। সেখানে গিয়ে দু-দশ দিন থাক্‌তে থাক্‌তেই সেখানেই মন বসে' যাবে। তখন আবার কল্‌-কাতায় আস্‌তে বল্‌লে হয় ত আস্‌তে চাইবে না।"

সুশীলার মাতা বলিলেন, "দিদি! সেই আশীর্ব্বাদই কর। মেয়ের আমার মন যেন ফিরে যায়। কিন্তু তার কথা শুনে, আর তার ভাবগতিক দেখে আমার মনটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে।"

বড়দিদি বলিলেন "ওই ছেলেমানুষের কথা শুনে মন খারাপ ক'রো না।"

সুশীলার মাতা তখন নিজে যাহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন, তাহারই একটা ফর্দ্দ করিলেন এবং তিনকড়িকে ডাকিয়া সেই ফর্দ্দ ও কিছু টাকা তাহার হাতে দিলেন।

তিনকড়ি বলিল "তা হ'লে তোমরা সত্যসত্যই যাবে ?"

সুশীলার মাতা বলিলেন "না গিয়ে কি করি ভাই! সতীশ বাবুর কথা ত অমান্য করা যায় না! তিনি যদি আশ্রয় না দিতেন, তাহ'লে এতদিন অদৃষ্টে কি হত, তা কে বল্‌তে পারে ? তুমি দাদা, একটু কষ্ট ক'রে এই জিনিষগুলো কিনে দাও; আর যদি পার, তাহ'লে সুশীলার আর কি কি দরকার, তা তার কাছ থেকে যদি শুনে নিতে পার, তাহ'লে বড়ই ভাল হয়। আমাকে ত সে কিছুই ব'ল্‌লে না।"

তিনকড়ি বলিল "তার জন্য ভাবনা কি? আমি এখনই তাকে ধরে, তার দরকারী জিনিষের ফর্দ্দ করে নিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনকড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

[১৩]

রবিবার সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সতীশ কম্বুলিয়াটোলায় সুশীলাদের বাসায় গেল। সেইদিন মধ্যাহ্নকালে সে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল।

সতীশ যখন ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তিনকড়ি দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। সতীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দীনেশ বাবুর স্ত্রী কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

তিনকড়ি বলিল, "হ্যাঁ এই বাড়ীতেই থাকেন। আপনি কোথা থেকে আস্ছেন?"

সতীশ বলিল, "আমি সাজাহানপুর থেকে আস্ছি।"

তিনকড়ি তখন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি সতীশ বাবু?"

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনকড়ি তাহাকে আদর করিয়া বৈঠকখানায় বসাইল। তার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক আন্তে ব'ল্ব কি?"

সতীশ বলিল, "না—আমি পান তামাক কিছুই খাই না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে সুশীলাকে ডেকে দিন।"

তিনকড়ি বলিল, "আপনি বসুন, আমি ভিতরে গিয়ে এখনই খবর দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সংবাদ পাইবামাত্র সুশীলা ও সুশীলার মা বৈঠকখানার ভিতর দিকের দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনকড়ি অপর দিক দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তাঁরা দুয়ারের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন।"

সতীশ বলিল, "সুশীলা, আমার সুমুখে আস্‌তে তোমার লজ্জা কি?—এ দিকে এস।"

সুশীলা দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া বৈঠকখানার ভিতর আসিল এবং সতীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি কি রেল থেকেই এখানে আস্‌ছেন?"

সতীশ বলিল, "না, আমি বারটার সময় কল্‌কাতায় পৌঁছেছি। কলেজষ্ট্রীটে আমাদের একটা বাসা আছে, সেইখানেই উঠেছি। তোমাদের সব ঠিকঠাক হয়েছে কি?"

সুশীলা বলিল, "হ্যাঁ, সব বাঁধাছাঁদা হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া সতীশ বলিল, "পঞ্জাবমেলে বড়

ভিড় হয়, তাইতে কা'ল বেলা দশটার সময় যে এক্স্‌প্রেস্‌ ছাড়ে, তাতেই যাওয়া স্থির করেছি। তোমরা কা'ল ভোরেই প্রস্তুত হয়ে থেক; আমি ঠিক সাড়েআটটায় এখানে এসে তোমাদের ষ্টেসনে নিয়ে যাব।"

এই কথা শুনিয়া সুশীলা বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় গেল এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা বল্‌লেন তাই হবে।"

সতীশ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে এখন আসি—দু'চার জনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে, কিছু জিনিষ-পত্রও কিন্‌তে হবে। তোমরা ঠিক হয়ে থেক, আমাকে এসে যেন দেরী কর্‌তে না হয়। আর তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর ত, এখানকার দেনাপত্র মিটিয়ে দিতে, আর তোমাদের দরকারী জিনিষপত্র কিনতে টাকাকড়ি চাই কি না।"

সুশীলা তাহার মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিল, "না, আর টাকার দরকার হবে না। মার হাতে যা ছিল, তাই থেকেই এখানকার ধার সব শোধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে; আর জিনিষপত্রও যা দরকার, তা কেনা হয়েছে।"

সতীশ তখন পকেট হইতে মণিব্যাগ খুলিয়া দশ টাকার দুইখানি নোট বাহির করিয়া বলিল, "যা কেনা হ'য়েছে, তা ত হ'য়েছেই, এই দুইখানি নোট তোমার মায়ের হাতে দাও; তাঁকে বল, আরও যা যা তাঁর মনে হয়, এই টাকা দিয়ে আজ রাত্রেই তা কিনে রাখেন।"

এই কথা শুনিয়া সুশীলা বলিল, "আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি, আরও টাকার দরকার আছে কি না।"

এই বলিয়া সুশীলা ভিতরে চলিয়া গেল এবং তখনই বাহিরে আসিয়া বলিল, "মা ব'ল্‌ছেন, যা যা দরকার সবই কেনা হ'য়েছে। তাঁর কাছে এখনও ত্রিশ বত্রিশ টাকা আছে। যদি তাঁর আরও কিছু মনে পড়ে, তাহ'লে সেই টাকা দিয়েই কিনে নেবেন; ও টাকা এখন আপনার কাছেই থাক।"

সতীশ তখন নোট দুইখানি পকেটে পূরিয়া বলিল, "আমি তা হ'লে এখন আসি—কাল ঠিক সাড়ে-আটটার সময় আস্‌ব।"

সুশীলা বলিল, "একটু জল খেয়ে যাবেন না?"

সতীশ বলিল, "না—অবেলায় খেয়েছি, এখন আর কিছু খাবার দরকার হবে না।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সুশীলা ও তাহার মাতা বড়দিদির সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। অনেক সুখদুঃখের কথা হইল। বড়দিদি সুশীলাকে কত উপদেশ দিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যাও, তোমরা এখন শোও গে। রাত্রি অনেক হ'য়েছে, কা'ল আবার খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে। এতদিন একসঙ্গে ছিলাম—তোমাদের উপর কেমন একটা মায়া বসে' গিয়েছিল—তোমরা চলে গেলে বড়ই কষ্ট বোধ হবে! তা যেখানেই থাক, ভাল আছ শুন্‌লেই সুখী হব। মা-কালী করুন, বাবু বেরিয়ে আসুন, আবার ঘর সংসার পাতুন, তোমাদেব এমন দিন থাকবে না বোন!"

এই কথার পর সুশীলা ও তাহার মাতা নীচে আসিয়া তাঁহাদের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

[১৪]

অতি প্রত্যূষেই বড়দিদির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখেন, তখনও বাড়ীর আর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সুশীলা ও তাহার মাকে জাগাইয়া দিবার জন্য তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন।

সুশীলাদের ঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখেন, দ্বার অল্প খোলা রহিয়াছে। তিনি বাহির হইতেই বলিলেন, "দেখ দেখি, ঘরের দুয়োর বন্ধ না ক'রেই শুয়ে আছে। ও সুশীলার মা, ওগো ওঠ।" এই বলিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। সুশীলার মাতা বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

বড়দিদি বলিলেন, "দুয়োর বন্ধ না ক'রেই শুয়েছিলে!"

সুশীলার মাতা বলিলেন, "না, দুয়োর বন্ধ ক'রে-ছিলুম। সুশীলা উঠে, বাইরে বেরিয়েছে, তাই খোলা র'য়েছে।"

বড়দিদি বলিলেন, "তাহ'লে এখন তাড়াতাড়ি উনুনে কয়লা দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে স্নানটা সেরে নাও। আমাদের ঘর থেকে বাসনপত্তর দিচ্ছি। সকাল সকাল দুটো ভাতেভাত

নামিয়ে নাও। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই আট্‌টা বেজে যাবে।” এই বলিয়া বড়দিদি তাঁহাদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুশীলার মাতা মনে করিলেন, সুশীলা বোধ হয় পায়খানায় গিয়াছে। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বড়দিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, “একটু তাড়াতাড়ি কর বোন্, আজ আর ব’সে ব’সে মুখ ধোবার সময় হবে না।”

সুশীলার মাতা বলিলেন, “মেয়ে এখনও পায়খানা থেকে বের হয় নি।”

বড়দিদি বলিলেন, “এতক্ষণ পায়খানায় বসে কি কচ্ছ সুশী, শীগ্‌গির বেরিয়ে এস—একটু তাড়াতাড়ি কর।” তাহার পর সুশীলার মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আজ এখানে, কাঁল এতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে।”

সুশীলার মাতা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কি ক’র্‌ব দিদি, অদৃষ্টে আরও কত দুঃখু আছে, কে জানে!”

বড়দিদি বলিলেন, “দেখ ত, মেয়েটা পায়খানায় বসে কি কর্‌ছে।”

সুশীলার মাতা তখন ধীরে ধীরে পায়খানার দিকে গিয়া

উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, পায়খানায় কেহ নাই। তিনি ভীতস্বরে বলিলেন, "কৈ দিদি, মেয়ে ত পায়খানায় নেই।"

বড়দিদি বলিলেন, "পায়খানায় নেই, বল কি? দেখ দেখি, উপরে ত যায় নি।"

সুশীলার মাতা তখন তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেলেন। বড়দিদি বৈঠকখানা-ঘরের দুয়ার খুলিয়া দেখেন, তিনকড়ি ও সুরেন অকাতরে ঘুমাইতেছে। তিনি তাহাদিগকে না ডাকিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন এবং সদর-দ্বারের দিকে যাইয়া দেখেন যে, দ্বার খোলা রহিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে আসিতেই সুশীলার মাতা উপর হইতেই বলিলেন, "কই, মেয়ে ত উপরেও নেই।"

বড়দিদি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "উপরেও নেই, নীচেও নেই—সে কি কথা! বাহিরের দোরও যে খোলা। ওরে তিনকড়ি, ও সুরেন, শীগ্‌গির ওঠ্‌ ত! ও ঘোষ মশাই, ওগো শীগ্‌গির উঠে এস—আমি ত—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, মেয়ে গেল কোথা!!"

বড়দিদির চীৎকার শুনিয়া "কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে" বলিয়া তিনকড়ি ও সুরেন বাড়ীর মধ্যে দৌড়াইয়া আসিল;

হরিশ্চন্দ্র উপরের বারান্দায় আসিয়া বলিল, "ওগো, কি হ'য়েছে, ব্যাপার কি ?"

বড়দিদি ভীতস্বরে বলিলেন, "সুশীকে যে বাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল ? ঘরের দোর খোলা, বাহিরের দোর খোলা,—মেয়ে কোথায় গেল ?"

সুশীলার মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনকড়ি বলিল, "সে কি কথা! সুশীলা কোথায় গেল ?"

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। তিনকড়ি, সুরেন্দ্র ও হরিশঘোষ সুশীলার অনুসন্ধানে বাহির হইল ; সুশীলার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বড়দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি হবে দিদি গো, জাত গেল, মান গেল, সব গেল—"

[১৫]

ঠিক বেলা সাড়ে-আটটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দীনেশের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িলেন। সতীশ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; দীনেশের স্ত্রীর রোদনের কারণ কি, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। দীনেশের স্ত্রীর সহিত সে পূর্ব্বে কখনও কথা বলে নাই;—আজ অকস্মাৎ তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে যে কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। সেই সময়ে হরিশ-ঘোষ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। সতীশ তাঁহাকে পূর্ব্বদিন দেখে নাই; সুতরাং সে যে এই বাড়ীর অধিকারী, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সতীশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান মশাই?"

সতীশের এই প্রশ্ন শুনিয়া দীনেশের স্ত্রী মাথা তুলিয়া দেখেন যে, তাঁহার পার্শ্বে হরিশঘোষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। হরিশ-ঘোষ সতীশের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমার নাম শ্রীহরিশ-

চন্দ্র দাস ঘোষ—এই বাড়ী আমারই। আপনারই নাম বুঝি সতীশবাবু ?"

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিলে, হরিশ বলিলেন, "আসুন, বৈঠকখানায় বসি।"

সতীশ বলিল, "আপনি আগে বলুন ব্যাপার কি—আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে।"

হরিশঘোষ তখন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা সতীশকে বলিলেন। তারপর তিনি নিজে, তাঁহার পুত্র এবং তাঁহার শ্যালক সুশীলার অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইয়াছিলেন—সে কথাও সতীশকে বলিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমার ছেলেকে গঙ্গার ঘাটে পাঠিয়েছিলুম, কি জানি মেয়ে যদি একেলা গঙ্গায় গিয়ে থাকে। তারপর আমার শ্যালক তিনকড়িকে তাদের কন্‌সার্টদলের ছোকরাদের খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে, আমি নিজে পাড়ার মধ্যে বেরিয়েছিলুম। কম্বুলেটোলা, রাজবল্লভপাড়া, হাটখোলা, কুমারটুলী, বেনেটোলা, আহিরীটোলা, খুঁজতে আমি বাকী রাখিনি। সেই ভোর থেকে আর এই বেলা সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে

ঘুরে ঘুরে হয়রান হ'য়ে এই আস্‌ছি মশাই! কোথাও ত তার খোঁজ পাওয়া গেল না। ছোঁড়ারা বোধ হয় এখনও ফেরেনি,—দেখি তারা কি ক'রে আসে! মেয়েটি বড় ভাল ছিল মশাই, বেশ নরম সরম, মুখ দিয়ে কথা বেরুত না। তার মনে যে এই ছিল, তা ত কেহই বুঝ্‌তে পারেনি। আর সে গেলই বা কার সঙ্গে! আমার বাড়ীর মধ্যে থাক্‌ত, তাদের কখনও কোথাও যেতে দিইনি, আপনার মেয়ের মত তাকে প্রতিপালন ক'রেছি—সে কি না এই কাজ কর্‌লে!"

সতীশ এই সকল কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তারপর, এখন উপায়? এখন কি করা যায়?"

হরিশঘোষ বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন; তিনকড়ি আর আমার ছেলে ফিরে আসুক; তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

তাঁহারা যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পাশের বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বৈঠকখানার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ওহে হরিশ,

মেয়েটার কোন খোঁজখবর পেলে? তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে, আমি জান্তেও পার্‌লাম না। শেষে শুনি যে, এই ব্যাপার। তা দেখ, আমি একটু খবর দিতে পারি। তুমি ত জানই, রাত্রিতে আমার বড় ঘুম হয় না। রাত বোধ হয় তখন তিনটে হবে, আমি একছিলিম তামাক সেজে নিয়ে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছি; এমন সময়ে দেখি কি না, একখানা ভাড়াটে-গাড়ী শ্যামপুকুরের দিক থেকে এল। গাড়ীখানা খুব আস্তে আস্তে এসে তোমারই দোরের সামনে দাঁড়াল। তারপর গাড়ীর দোর খুলে একটা ছোঁড়া নামল। আমি ভাবলুম, তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা বুঝি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, তখন ফিরে এল। তাই আমি সেদিকে আর বড় চাইলুম না। মিনিট দুই পরেই গাড়ীখানা চলে গেল। আমার মনে ত কোন সন্দেহ হবার কারণ নেই—কি বল হরিশ? আর যে ছোঁড়াটা নামল, সে ঠিক তিনকড়িরই মত। তখন যদি বুঝ্‌তে পারতুম যে, ব্যাপার এই, তাহ'লে কি আর এমন কাণ্ড হয়! আমি এখন বলি কি, তুমি এক কাজ কর, আজ আর আপিসে নাই গেলে। আমাদের এই পাড়ায় যে কটা গাড়ীর আস্তাবল

আছে, সেখানে গিয়ে খোঁজ কর যে, কাল রাত্তির তিনটের পর কোন গাড়ী তোমার বাড়ীতে এসেছিল কি না—তাহলেই খোঁজবার একটা পথ পাওয়া যাবে। তুমি যাই মনে কর হরিশ, আমি ঠিক ব'লছি, এ কাজ তোমার বাড়ীতে যে আড্ডা বসে, সেই আড্ডারই কোন হতভাগা ক'রেছে। আর তুমি রাগই কর বা যাই কর, তোমার ছেলেরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে ;—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কি এমন হয়, না হ'তে পারে !"

হরিশ তাঁহার কথায় বাধা দিয়ে বলিলেন, "না, চাটুয্যে মশাই—তিনকড়ি, কি আমার ছেলে এর মধ্যে নিশ্চয়ই নেই। তারা বৈঠকখানায় ঘুমুচ্ছিল। তাদের যখন ডেকে তুলে কথাটা বলা গেল, তখন তারা যেন আকাশ থেকে প'ড়্ল। তারপর হাতেমুখে জল না দিয়েই তারা মেয়েটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। তারা গান-বাজনা, আমোদ-আহ্লাদ করে বটে, কিন্তু তাদের বদ্‌চাল কি কখনও কিছু দেখেছেন ?"

চাটুয্যে মশায় বলিলেন, "তা যাই বল হরিশ, এ কাজ এই আড্ডা থেকেই হ'য়েছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি কেউ কখন এমন অড্ডা ব'স্‌তে দেয়। তোমায় কতবার এ কথা

ব'লেছি; তুমি কোন কথায় কাণ দাওনি,--এখন তার ফল হাতে হাতে ফল্‌ল। দেখ্‌লে ত, এক ভদ্রলোকের জাত, মান, সব গেল। পাড়ারও একটা বদ্‌নাম হল। আমি এখন চল্‌লুম; যা খবর পাও আমাকে জানিও।"—এই বলিয়া চাটুয্যে মশায় চলিয়া গেলেন।

সতীশ তখন হরিশঘোষকে বলিল, "ঘোষ মশাই, আপনি একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে দীনেশের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, কি করা যায়।"

হরিশ বলিলেন, "ছেলেরা ফিরে আসুক, তারপর যা হয় পরামর্শ ক'রে করা যাবে।"—এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। সতীশ সেই বৈঠকখানায় একেলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

মিনিট দুই পরেই বাড়ীর মধ্যে তিনকড়ির গলা শুনিতে পাওয়া গেল। তিনকড়ি বরাবর বাড়ীর মধ্যে গিয়া বলিল, "বড়দি, এ নিশ্চয়ই সেই যোগেশ শালার কাজ। আমাদের এখানে যারা যারা আসে, আমি সে সব শালার বাড়ীতে গিয়েছি; সব্বাই বাড়ীতে আছে, শুধু সেই শালাই নেই। শুন্‌লুম, সে কা'ল সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে,

তারপর আর বাড়ী ফিরে যায় নি। নিশ্চয়ই সেই শালার কাজ। তোমায় বল্‌ছি বড়দি, তাকে খুন করে ফাঁসী যাব সেও স্বীকার, তবু তাকে দেখে নেব; আর তোমায় ব'ল্‌ছি বড়দি, আজ থেকে কোন শালাকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দের না। খুব শিক্ষা হ'য়েছে—তিনকড়ি যদি আর বেহালার গায় হাত দেয়, তাহ'লে তার বড় দিব্যি রইল।"

বড়দিদি বলিলেন, "সে ত হ'ল, এখন কি করা যায়? সতীশ বাবু যে এসে বাহিরে বসে আছেন?"

এই কথা শুনিয়া তিনকড়ি যেন এতটুকু হইয়া গেল। সে বলিল, "তাই ত বড়দি, তাঁকে কি বলা যায়—আর কোন্ মুখেই বা তাঁর স্বমুখে যাই!"

এই সময় দীনেশের স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার চক্ষুতে তখন জল নাই—মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে;—একটা দৃঢ়তা, একটা তেজ যেন তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। তিনি বাহিরে আসিয়াই কঠোর-স্বরে বলিলেন "কি ক'র্‌তে হবে দিদি, তুমি তা ভেবে পাচ্ছ না? আমার কাছে শোন, কি ক'র্‌তে হবে। তিনকড়ি—ভাই আমার, সতীশ বাবুর গাড়ী বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে—আমার জিনিষ-

পত্রগুলো গাড়ীতে তুলে দে। আমার মেয়ে নেই,—কা'ল রাত্রে তাকে কাশীমিত্রের ঘাটে পুড়িয়ে রেখে এসেছি। আমার মেয়ে? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—ভুলে যাও তোমরা আমার কোন মেয়ে ছিল না। আমার গর্ভে অসতী মেয়ের জন্ম হয়নি। যাও সতীশ বাবুকে বল, আমি তাঁর সঙ্গে যাবে। আর তোমাদেরও ব'ল্‌ছি, তোমরা তার খোঁজ ক'র না—সে আমার মেয়ে নয়—আমি তাকে চাইনে—আমি তার ছায়াও মাড়াব না। আমার মেয়ে অসতী?—আমার মেয়ে বেরিয়ে গেল!—এ কথা মনে ক'র্‌লেও পাপ হয়। তিনকড়ি ভাই, দাঁড়িয়ে থেক না। বড়দিদি, তুমিও এস—সবাই মিলে হাতে হাতে জিনিষগুলো বার করি।"—এই বলিয়া দীনেশের স্ত্রী যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বড়দিদি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "অত উতলা হয়ো না বোন—সতীশ বাবু বাহিরে আছেন, এখন তিনিই তোমার একমাত্র আপনার জন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। তিনি যা বলেন, তাই করা যাবে। তিনকড়ি, তুই বৈঠকখানায় গিয়ে সতীশবাবুকে সব কথা বল্—তিনি যা বলেন, শুনে আয়।"

সতীশ বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। তিনকড়ির আগমনের অপেক্ষা না করিয়াই সে বলিল, "দীনেশের স্ত্রী যা ব'ল্‌ছেন তাই ভাল; তিনি এখনই আমার সঙ্গে চলুন। সুশীলা আমাদের মেয়ে নয়, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।"—এই বলিয়াই সে বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেল এবং কোচম্যানকে জিনিষপত্র লইয়া আসিতে বলিল।

তখন কোচম্যান ও তিনকড়ি জিনিষপত্র আনিয়া গাড়ীতে তুলিল। দীনেশের স্ত্রী বড়দিদির পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দিদি, আমার একটা অনুরোধ—তার আর খোঁজ কোরো না—মাঝে মাঝে এ হতভাগিনীর খবর নিও।"—তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না—তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

তিনকড়ি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন "তিনকড়ি, ভাই—আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তুমি মানুষ হবে।" তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

সতীশ কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, দীনেশের স্ত্রী আর লজ্জা করিতে পারিলেন না—তিনি বলিলেন, "না, না, আপনি কোচবাক্সে বসবেন কেন ?—আপনি যে আমার বড় ভাই—আপনি ভিতরে আসুন।" সতীশ অগত্যা গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া অপর আসনে বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[১৬]

মাতাপিতা বড় আদর করিয়াই কন্যার নাম সুশীলা রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা কি জানিতেন যে, তাঁহাদের আদরিণী কন্যা এমন করিয়া কুলে কালি দিয়া চলিয়া যাইবে। বাল-বিধবাকে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপযুক্ত করিতে হয়, হিন্দুগৃহে অনেকেই সে সম্বন্ধে উদাসীন, দীনেশও সেই দলেরই একজন ছিলেন। কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার আচরণে কন্যা কুশিক্ষাই লাভ করিয়াছিল। একমাত্র সন্তান সুশীলা যখন বিধবা হইল, তখন দীনেশ ও তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে আরও অধিক আদর দিতে লাগিলেন। সে যখন যাহা চাহিত—তাহাই পাইত। সুশীলা কোন অন্যায় আব্‌দার করিলেও দীনেশ তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী যদি কখন কোন বিষয়ে আপত্তি করিতেন, তাহা হইলে দীনেশ একই কথা বলিতেন, "আহা ছেলে মানুষ, ও এখন যা চায় তাই দিতে হয়। বড় হ'লে যখন নিজের দুরদৃষ্টের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে, তখন

আর কিছুই চাইবে না।" বাল্যকাল হইতে সে এই ভাবে আদর পাইয়া আসিয়াছে ; সে কোন দিন সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই। সম্মুখে বসিয়া দীনেশ ইয়ার-বন্ধু লইয়া কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছে, মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়াছে ; সেখানে সুশীলা কি সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে ? তাহার পর মাতার বিবেচনার ত্রুটীতে তাহারা যে বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সে বাটী কুশিক্ষালাভেরই সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। এ অবস্থায় পূর্ণ যুবতী যে পাপের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কু-পথে পদার্পণ করিবে, রমণীর অমূল্যধন সতীত্ব-রত্ন বিসর্জ্জন দিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। তথা-কথিত সুশিক্ষা লাভ করিয়াও যখন কত যুবকের পদস্খলন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অশিক্ষিতা, বিলাসে পরিবর্দ্ধিতা যুবতীর পক্ষে আপাতরম্য প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড় সহজ কথা নহে। এই কথাটি বুঝিতে না পারায় কত পরিবারে কলঙ্ক-কালিমা পড়িয়াছে, কত গৃহে গোপনে কত কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যুবতী সুশীলা এই প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল !

সুশীলার পাপ-জীবনের এই অধ্যায়টি অলিখিত থাকিলেই ভাল হইত। পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে লেখনী সঙ্কুচিত হইয়া আসে। যে বঙ্গ-বিধবার পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের মহীয়সী-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হয়, সেই বঙ্গ-বিধবার শোচনীয় পাপ-কাহিনী বর্ণনা করার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? মাতা—ভগিনী—স্ত্রী—কন্যার সম্মুখে এ কথা যে বলিতে পারা যায় না! বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে! পাঠক-পাঠিকাগণ, ক্ষমা করিবেন, আমি সুশীলার জীবনের এই অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিব না। অভাগী সুশীলার জীবনের এই অংশের কথা অতি সংক্ষেপে যেটুকু নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিয়া শেষ করিব।

সুশীলা যখন তাহার মাতার নিকট শুনিল যে, তাহাদিগকে পশ্চিমে যাইতে হইবে, তখনই সে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তিতে তাহার মাতা কর্ণপাত না করায় সে প্রথমে তিনকড়ির শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তিনকড়িও যখন বড়দিদি ও সুশীলার মাতার মত-পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া সুশীলাকে পশ্চিমে যাইবার জন্যই

বলিল, তখন সুশীলা তিনকড়ির উপর চটিয়া গেল। পশ্চিমে যাওয়া বন্ধ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া সে তিনকড়ির বন্ধু যোগেশের সাহায্য-প্রার্থনা করাই স্থির করিল।

ইতঃপূর্ব্বে সে কখনও যোগেশের সহিত কথা বলে নাই ; কিন্তু যোগেশের ভাবভঙ্গি, চাহনি—কটাক্ষ সে অনেক পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার পর অনেক সময়ে পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারেই সুশীলা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে যোগেশকে যে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবে, যোগেশ তাহাতেই সম্মত হইবে। কিন্তু ঐটুকু বাড়ীর মধ্যে অপরের অজ্ঞাতসারে যোগেশের সহিত পরামর্শ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

এই ভাবিয়া সে যোগেশকে একখানি পত্র লিখিল এবং অন্যের অগোচরে নানা কৌশলে সেই পত্রখানি যোগেশের হাতে পৌঁছাইয়া দিল।

এই পত্র পাইয়া যোগেশ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে এত-দিন তাহার অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, সুশীলা নিজেই সেই সুযোগ তাহার সম্মুখে

উপস্থিত করিয়া দিল। সুশীলার পত্রের উত্তরে যোগেশ যাহা লিখিয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, রবিবার রাত্রি-শেষে যোগেশ আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবে। সেই সঙ্কেত-অনুসারে সুশীলা বাহির হইয়া আসিবে। যোগেশ তখন তাহাকে লইয়া কালীঘাটে যাইবে এবং সেখানে তাহার এক বিধবা মাসী একাকিনী বাস করেন—সেইখানে তাহাকে দুই তিন দিনের জন্য লুকাইয়া রাখিবে। তাহার পর সতীশ আসিয়া যখন দেখিবে যে, সুশীলাকে পাওয়া যাইতেছে না, তখন সে সুশীলার মাতাকে কন্যার অনুসন্ধানের জন্য নিশ্চয়ই রাখিয়া যাইবে। সেই সময়ে যোগেশ গোপনে সুশীলাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। তাহা হইলে তাহাদের আর পশ্চিমে যাইতে হইবে না। সুশীলা এই প্রস্তাবে কোন দোষই দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিলে মাতা একটু বকিবেন; পশ্চিমে যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য সে বকুনি সহ্য করিতে সে প্রস্তুত হইল। তাহার পর; দুই তিন দিবস সে যখন যোগেশের বিধবা মাসীমাতার নিকট থাকিবে—তখন আর দোষ কি! তাহার মনে অন্য কোন ভাব উপস্থিত হইয়াছিল কি না—

ভগবান্ জানেন। যোগেশের পত্রের উত্তরের পরিবর্ত্তে পরদিন সন্ধ্যার সময় যোগেশ যখন আড্ডায় আসিল, সুশীলা তখন বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর দিকের দ্বারের পর্দ্দা একটু সরাইয়া সহাস্যবদনে ইঙ্গিত করিয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

যোগেশের অবস্থা মন্দ ছিল না। তাহারা দুটী ভাই। পিতা নাই, মাতা বর্ত্তমান। বাগবাজারে বাড়ী। তাহার বড় ভাই কলিকাতার এক ইংরেজ-সওদাগরের আফিসে চাকরি করে—দেড় শত টাকা বেতন পায়। উপরি-পাওনাও মাসে প্রায় ঐ রকম। যোগেশের দাদাই সংসার চালায়। যোগেশ সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া এখন খায়, দায়, ইয়ার্কী দিয়া বেড়ায়—কন্‌সার্ট-পার্টিতে বেহালা বাজায়—আরও কত কি করে। তার মায়ের হাতে যথেষ্ট নগদ টাকা আছে। বাবুগিরি এবং অপব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, মায়ের নিকট আব্‌দার করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়। যোগেশ অবিবাহিত। যোগেশের এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। এইটুকুতে যিনি কলিকাতার বয়াটে ছোকরা যোগেশকে চিনিতে না পারিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করা নিতান্তই নিরর্থক।

যোগেশ এবার যে খেলা খেলিতে যাইতেছে, তাহা ত দু দশ টাকায় হইবে না ;—তাহার জন্য কিঞ্চিৎ অধিক অর্থের আবশ্যক। মাতার নিকট চাহিয়া সে দশ-পনর টাকা পাইতে পারে ; কিন্তু দুই তিন শত টাকা তাহার মাতা তাহাকে একযোগে দিবেন না, তাহা সে জানিত ; সুতরাং নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত মাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করাই সে সুব্যবস্থা মনে করিল। তাহার অদৃষ্টগুণে রবিবার সন্ধ্যার সময় অপহরণের সুযোগও উপস্থিত হইল। তাহার বড় ভাইয়ের স্ত্রী সন্তানসম্ভবিতা হওয়ায় তাঁহার পিত্রালয় ভবানীপুরে ছিলেন। রবিবার অপরাহ্নকালে সংবাদ আসিল যে, বধূ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্রই যোগেশের মাতা বাড়ীর ঝিকে সঙ্গে লইয়া ভবানীপুরে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, বধূকে সুস্থ শান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহার একটু অধিক রাত্রি হইবার সম্ভাবনা। মাতার এই অনুপস্থিতির সুযোগে শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র মাতার সর্ব্বদা ব্যবহারের বাক্সটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল— লোহার সিন্দুকের উপর আক্রমণ করিতে তাহার সাহস হইল

না। সেই বাক্সের মধ্যে যোগেশচন্দ্র নগদে ও নোটে ১৬৩৮৵১০ আনা পাইল। যোগেশ অবিবেচনার কাজ করিল না। গৃহস্থের লক্ষ্মীর বাক্স একেবারে শূন্য রাখিতে নাই—তাই সে ১৬৩৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্ট সাড়ে তের আনা গৃহস্থের কল্যাণের জন্য বাক্সের মধ্যে রাখিয়া মাতার আগমনের পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিল। এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, যোগেশের কোন মাসী নাই। কালীঘাটে বিধবা মাসীমার বাড়ী সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—সুশীলাকে নিশ্চিন্ত করিবার কৌশলমাত্র।

রবিবার শেষরাত্রিতে পূর্ব্ব-ব্যবস্থা অনুসারে যোগেশ একখানি ভাড়াটিয়া-গাড়ী লইয়া আসিয়া সুশীলাদিগের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সুশীলা জাগিয়া ছিল;—সঙ্কেত শুনিবামাত্র সে দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত না লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যোগেশ বুদ্ধিমান্ ছেলে; সে গাড়ীতে উঠিয়া সুশীলার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল না—সম্মুখের আসনে বসিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

[১৭]

গাড়ীতে বসিয়া সুশীলা কি ভাবিতেছিল, তাহা সুশীলাই বলিতে পারে ;—যোগেশ কি ভাবিতেছিল, তাহা যোগেশই জানে। ঐ প্রকার অবস্থায় পড়িলে, ঐ সময়ে কাহার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও আছে কি না জানি না ;—আমার ত নাই। তাহারা উভয়েই গাড়ীর মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; গাড়ীখানি চিৎপুর রোড ও শোভাবাজার ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল এবং ষ্ট্র্যাণ্ডরোড বাহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। সুশীলা বোধ হয় তখন গাঢ় চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল ; নতুবা কালীঘাটে যাইবার যে ও পথ নয়, তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত এবং সে সম্বন্ধে প্রশ্নও করিত। গাড়ী যখন হাবড়ার সেতুর উপর উঠিল, তখন বোধ হয় গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দে তাহার গভীর-চিন্তা ভঙ্গ হইয়া গেল। সুশীলা গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াই বলিল, “আমরা কোথায় যাচ্ছি ? এ ত কালীঘাটের পথ নয়।”—এই তাহার প্রথম কথা।

যোগেশ এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। তবুও সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কালীঘাটে যাওয়া ঠিক হবে না, মনে করিয়া আমি সে বন্দোবস্ত বদ্‌লে ফেলেছি।"

সুশীলা ব্যগ্রস্বরে বলিল, "কেন? কালীঘাটে যাওয়া হবে না? তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

যোগেশ বলিল, "তুমি ভয় ক'র না; তোমার ভালর জন্যই কালীঘাটে যাওয়ার ব্যবস্থা উল্টে দিয়েছি। সকাল হ'লেই তোমার খোঁজ হবে। তিনকড়ি তখন নিশ্চয়ই নানা জায়গা খুজ্‌তে খুজ্‌তে আমাদের বাড়ীতেও আমার খোজে আস্‌বে! তার মনে যদি সন্দেহ হয় যে, আমিই তোমার পালাবার সাহায্য ক'র্‌ছি, তাহ'লে আমি যেখানে যেখানে গিয়ে থাকি, তার সব জায়গায়ই সে যাবে; কালীঘাটে আমার মাসীর বাড়ীও যাবে; তাহ'লে ত তোমাকে ধরে ফেল্‌বে। এই কথা ভেবেই আমি সে বন্দোবস্ত উল্টিয়ে দিয়েছি। তোমাকে আর সে কথা—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সুশীলা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে

বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে কি হবে? তুমি তবে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

যোগেশ বলিল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি যা ক'রছি, তোমার ভালর জন্যই ক'রচি। আমি ঠিক ক'রেছি, রেলে চড়ে' আমরা তারকেশ্বরে যাব। সেখানে যাত্রীদের থাক্‌বার জন্যে অনেক জায়গা আছে। তোমার কোন কষ্ট হবে না। দুই তিন দিন সেখানে থেকে, আমরা আবার ক'ল্‌কাতায় ফিরে আস্‌ব; তখন তুমি তোমার মার কাছে যেও। এতে যদি তোমার অমত হয়, তাহ'লে বল, গাড়ী ফিরিয়ে নিতে বলি; তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌছিয়ে দিই। তোমারই ভালর জন্যে, তোমারই অনুরোধে আমি এতটা ক'র্‌ছি। তুমি যদি তা ভাল না মনে কর, চল ফিরে যাই। শেষে কিন্তু ব'ল্‌তে পারবে না যে, আমি তোমার কথা রাখিনি।"

সুশীলা ধীরভাবে বলিল, "না, সে কথা আমি ব'ল্‌ছিনে। তুমি যে কিছু মন্দ ভেবে কাজ ক'র্‌ছ, তা ত আমি ব'ল্‌ছিনে। কিন্তু—"

যোগেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এর মধ্যে ত

কোন 'কিন্তু' নেই সুশীলা! ভাল বোঝ চল ; ভাল মনে না হয়, মনে সন্দেহ হয়, ফিরে চল ; এখনও রাত আছে, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিই। মিছেমিছি আমি একটা কলঙ্ক ঘাড়ে ক'র্‌তে যাই কেন? তুমি বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চেয়েছিলে, অন্য কেউ হ'লে এ সাহায্য ক'র্‌ত না ;—তোমার অবস্থা ভেবে আমার মনে বড় দুঃখ হ'য়েছিল, তাই তোমার জন্য আমি এই দুর্নামের বোঝা ঘাড়ে নিতে এসেছি।"

সুশীলা আরও কাতরভাবে বলিল, "আমি ত সে কথা বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছিলাম যে, তোমার মাসীমার কাছে গিয়ে দুদিন থাক্‌লে কোন কথাই ছিল না। আমি একলা, মেয়েমানুষ, দুতিন দিন বিদেশে থাক্‌ব, তাই যা ভাবছি।"

যোগেশ বলিল, "তার আর অত শত ভাবনা কেন? গাড়োয়ানকে গাড়ী ফিরাতে বলি।"

সুশীলা তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল কথা ভাবিয়া ফেলিল। কি ভাবিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে ; পরক্ষণেই বলিল, "না—না—তা হবে না,—বাড়ী ফিরে যাওয়া হবে না। তুমি মনে কিছু কোরো না, তোমাকে সন্দেহ করছিনে।

মা গঙ্গা সাক্ষী, তোমাকে সন্দেহ কর্‌লে, আমি তোমার সঙ্গে আস্‌তুমও না। তুমি যে আমার ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছ, তা আমি বুঝ্‌তে পারছি।" এই বলিয়া সুশীলা নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল; গাড়ী কিন্তু তখন রেলের সেতু পার হইয়া হাবড়ার ময়দানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যোগেশ হাবড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইবার গাড়ীভাড়া করে নাই। শেষ রাত্রিতে হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া গাড়ীর অপেক্ষায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ষ্টেসনে বসিয়া থাকা নানাকারণে নিরাপদ নয়, মনে করিয়া সে কোন্‌নগর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য গাড়ীভাড়া করিয়াছিল।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সুশীলা গাড়ীর মধ্যে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল—সে কি চিন্তা করিতেছিল, তাহা সেই বলিতে পারে; তবে তাহার চক্ষে যে নিদ্রা আসিল না, তাহাতেই বুঝিতে পারা গেল, সে ভালমন্দ অনেক কথা ভাবিতেছিল। সম্মুখের আসনে বসিয়া যোগেশ প্রথমে ঝিমাইতে লাগিল; তাহার পর সে নিদ্রাভিভূত হইল। তাহার মনে ত কোন চিন্তা ছিল না। সে এতদিন যাহাকে হস্তগত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া

আসিতেছিল, সে সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যথাসময়ে গাড়ী কোন্‌নগর ষ্টেসনে পৌঁছিল। তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। যোগেশ প্রথমে সুশীলাকে গাড়ী হইতে নামাইল। তাহার পর গাড়োয়ান গাড়ীর ছাতের উপর হইতে একটি নূতন ষ্টীলট্রাঙ্ক ও একটা বিছানা নামাইয়া দিল। যোগেশ প্রথমে মনে করিয়াছিল, বিছানা বা বাক্স বা আর কিছু সঙ্গে লইবে না। কিন্তু সে পরে ভাবিয়া দেখিয়াছিল যে, তাহাদের সঙ্গে কোন জিনিষপত্র না থাকিলে লোকের মনে সহজেই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সে ত পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল যে, সুশীলাকে সে কালীঘাটেও লইয়া যাইবে না, তারকেশ্বর বা বৈদ্যনাথেও লইয়া যাইবে না—তাহাকে লইয়া একেবারে পাপ ও পুণ্যের লীলাভূমি কাশীধামে উপস্থিত হইবে। তাই সে সঙ্গে বাক্স ও বিছানা লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। দুষ্ট-বুদ্ধি এত পাকা না হইলে, বুঝি কেহ এমন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না!

বাক্স, বিছানা ও সুশীলাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসন-গৃহে

পৌঁছিয়া, যোগেশ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, পশ্চিম-গামী গাড়ী আসিতে, তখনও প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সারারাত্রি জাগিয়া যোগেশ বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ীর বিলম্ব আছে দেখিয়া সে সেইস্থানে স্নান করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইবার কথা মনে করিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, কাজটা ঠিক হইবে না। কারণ সে সুশীলাকে বলিয়াছে যে, তাহারা তারকেশ্বরে যাইতেছে। তারকেশ্বরের যাত্রী কেহই পথের মধ্যে স্নানাহার করিতে পারে না—তাহার প্রয়োজনও হয় না। সুশীলার নিকট স্নানাহারের প্রস্তাব করিলে, হয় ত তখনই তাহার অভিসন্ধি ধরা পড়িবে। এই ভয়ে সে উক্ত প্রস্তাব করিতে পারিল না।

সুশীলা এতক্ষণ পরে কথা বলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাবড়া ষ্টেসন থেকে গাড়ীতে না উঠে এ কোন্‌নগর ষ্টেসনে এলে কেন?"

যোগেশ হাসিয়া বলিল, "এ সোজা কথাটাও বুঝতে পারছ না! অত রাত্রে হাবড়া ষ্টেসনে এসে বেলা আটটা পর্য্যন্ত ব'সে থাক্‌লে কেউ না কেউ তোমার খোঁজে হাবড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত এসে তোমাকে অনায়াসে ধরে ফেল্‌তে পারে—এই

কথা মনে করে, একেবারে কোন্‌নগর পর্যান্ত গাড়ীভাড়া করেছিলাম।”

সুশীলা বলিল—“হ্যাঁ—সে বেশই হয়েছে। হাবড়া ষ্টেসনে এসে কেউ যদি আমাদের ধরে ফেল্‌ত, তাহলে বড়ই বিপদ হ’ত। তারকেশ্বরের গাড়ী আস্‌তে দেরী কত ?”

যোগেশ বলিল, “আরও দেড়ঘণ্টা দেরী। দু তিনখানা গাড়ী চলে গেলে তবে তারকেশ্বরের গাড়ী আস্‌বে।”

সুশীলা তখন বাক্সটীর উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। যোগেশ প্লাটফরমে পাইচারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুই তিনখানি গাড়ী চলিয়া গেল, যখন পশ্চিমগামী গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল, তখন যোগেশ দুইখানি কাশীর তৃতীয়-শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ী হুস্‌ হুস্‌ করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া থামিলে, সুশীলাকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে তুলিয়া না দিয়া, সে তাহাকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

[১৮]

সুশীলাকে লইয়া যোগেশ যে কামরায় উঠিয়াছিল, সে কামরায় হিন্দুস্থানী কেহ ছিল না। চার পাঁচজন বাঙ্গালী ছিল—তাহারাও দূরযাত্রী নহে। রাস্তার মধ্যে দুই তিন জন নামিয়া গেল; অবশিষ্ট কয়েকজন বর্দ্ধমানে নামিল। বর্দ্ধমান হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন সে কামরায় সুশীলা ও যোগেশ ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

সুশীলা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার তাহার পিতামাতার সহিত তারকেশ্বরে গিয়াছিল। তারকেশ্বর যে বর্দ্ধমানের এদিকে, তাহা সে জানিত। আর তারকেশ্বরে যাইতে হইলে যে এত দীর্ঘকাল গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হয় না, ইহাও সে জানিত। কিন্তু এতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে অন্য লোক ছিল, সেইজন্য সে যোগেশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। মস্তকে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন দিয়া সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। যোগেশ বর্দ্ধমান ষ্টেসনে কিছু জলখাবার কিনিয়াছিল এবং বাক্সের মধ্য হইতে একটী নূতন ঘটি বাহির করিয়া এক ঘটি জল লইয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িবার পর যোগেশ সুশীলাকে বলিল, "সুশীলা, আজ ত স্নান করা হ'ল না, বেলাও অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে, কিছু খাবার খেয়ে নাও।"

সুশীলা ধীরস্বরে বলিল, "আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তারকেশ্বর যেতে ত এত সময় লাগে না—আর তারকেশ্বর ত বর্দ্ধমানের ঢের ওদিকে!"

যোগেশ একটু হাসিয়া বলিল, "কোথায় তারকেশ্বর? আমরা কাশী যাচ্ছি!"

সুশীলা ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল, "কাশী! কাশী যাব কেন? তুমি বল্‌ছ কি?"

যোগেশ বলিল, "যা সত্যি কথা, তাই তোমাকে বল্‌ছি। তারকেশ্বরে যাওয়া মিথ্যা কথা। আমি আগে থেকেই কাশী যাওয়া স্থির করেছিলাম। তোমাকে আগে এ কথা জানালে তুমি হয় ত আস্‌তে চাইবে না; সেই মনে করে তোমাকে কিছু বলি নাই।"

সুশীলার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিল, যোগেশ তাহাকে অকূলে ভাসাইতে আনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই চীৎকার করিয়া সেই গাড়ীর

লোকদিগকে বলে, "ওগো, তোমরা দেখ, এই লোকটা আমাকে ভুলিয়ে জোর করে কাশী নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে তোমরা রক্ষা কর।" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, তাহাতে কি লাভ হইবে; শুধু লোকজানাজানি, লজ্জা, অপমান! চেঁচামেচি করিলে হয় ত গাড়ীর লোকেরা সমস্ত কথা শুনিয়া পরের ষ্টেসনে তাহাদিগকে পুলিসের জিম্মা করিয়া দিবে। না—না—তা হইতেই পারে না!

সুশীলা যোগেশকে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আশঙ্কায়, ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—তাহার বুক দুরুদুরু করিতেছিল—তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল।—সমস্ত রাত্রি জাগরণ; দুশ্চিন্তা, অনাহার, দীর্ঘপথ ভ্রমণ;—তাহার পর এই অকস্মাৎ বজ্রপাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—সে ধীরে ধীরে গাড়ীর জানালার উপরে মাথা দিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া যোগেশও কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর সুশীলাকে বলিল, "ওগো, কি ভাব্‌ছ! এই বেলা দুটো খেয়ে নাও, পরের ষ্টেসনে যদি কেউ গাড়ীতে উঠে, তাহলে আর তোমার খাওয়ার সুবিধা হবে না।"

সুশীলা এই কথা শুনিয়া মাথা তুলিল। যোগেশ দেখিল সুশীলা কাঁদিতেছে ; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে ; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া যোগেশ আর কথা বলিতে সাহসী হইল না।

সুশীলা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে বলিল, "আমার পাপের শাস্তি আরম্ভ হয়েছে। তুমি আর সে শাস্তি বাড়িয়ে দিও না। যদি জল খেতে হয়, কাশীতে গিয়ে খাব—তার আগে আর না! মাগো—"এই বলিয়া সুশীলা সেই বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

পরের ষ্টেসনেও কেহ সে কামরায় উঠিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে যোগেশ দুই তিনবার সুশীলাকে ডাকিল। সুশীলা কোন উত্তর দিল না। যোগেশ তখন উঠিয়া সুশীলার নিকটে গেল, তাহার গায়ে হাত দিয়া ঠেলিতে লাগিল। সুশীলা একবার মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল।

যোগেশ বলিল, "সারাদিন উপোস করে থাকলে অসুখ করবে ; একটু কিছু খাও।"

সুশীলা বলিল, "আমাকে তুমি বিরক্ত ক'র না। আমি

কাশী পৌঁছিবার পূর্ব্বে জলবিন্দুও মুখে দেব না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

যোগেশ অনন্যোপায় হইয়া যেখানে বসিয়া ছিল, সেইখানে যাইয়া বসিল।

পার্শ্বের কামরায় একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও কয়েকজন হিন্দুস্থানী বসিয়া ছিল; হিন্দুস্থানী কয়টি নিজের নিজের কথায়, গল্পে ব্যস্ত ছিল। তাহারা অনেক দিন পরে দেশে যাইতেছিল; দেশের কথা, কলিকাতা-নগরীর কথা, মনিবের কথা, সাহেবের কথা, নিজেদের সুখদুঃখের কথা, প্রভৃতিতেই তাহারা ব্যস্ত ছিল। তাহারা সুশীলা বা যোগেশের দিকে লক্ষ্য করে নাই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি একাকী বসিয়া ছিলেন; তিনি যোগেশ ও সুশীলার গতিবিধি দেখিতেছিলেন; তবে গাড়ীর ঘর্ঘরশব্দে তাহাদের কথোপকথন কিছুই শুনিতে পান নাই।

পরের ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে ভদ্রলোকটি যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাবেন মশায়?"

যোগেশ বলিল, "কাশী।"

"কাশীতেই কি থাকা হয়?"

যোগেশ অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিল, "আজ্ঞে না, কাশীতে থাকি না! আমার মা সেখানে থাকেন। মার অসুখের টেলিগ্রাম্ পেয়ে আমার এই বিধবা বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বর্দ্ধমানে অনেকক্ষণ গাড়ী ছিল, মেয়েটিকে স্নান করিয়ে একটু জল খাইয়ে নিলে পারতেন।"

যোগেশ বলিল, "কোন্নগর থেকে গাড়ীতে উঠ্‌বার আগে স্নান করিয়ে নিয়েছিলুম, জল খাওয়াবার সময় পাই নাই। বর্দ্ধমান থেকে খাবার কিনে নিয়ে এই এতক্ষণ ধরে খেতে বল্‌ছি, কিন্তু ও কিছুতেই খাবে না। বলে, কাশীতে গিয়ে মাকে সুস্থ দেখে জলগ্রহণ করব। বিধবা ছোটবোন, সারাদিনরাত উপোস করে থাক্‌বে, আর আমি খাব— তা ত হয় না; তাই খাবার ফেলে রেখে দিয়েছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি দুটো খান। আমাদের হিন্দুর ঘরের বিধবা কি গাড়ীতে জল খায়! আর আপনিই বা তেমন অনুরোধ কর্‌ছেন কেন? অদৃষ্টে যদি খাওয়াপরাই থাক্‌বে, তবে আর ভগবান্ ও বয়সে

বিধবা করবেন কেন? আমিও মশাই, ঐ রকম একটি বিধবা মেয়ে নিয়ে পুড়ছি। ও যে কি জ্বালা, তা আর বলবেন না মশায়!”—এই বলিয়া ভদ্রলোকটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যোগেশ তখন জলখাবারগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিল। পূর্ব্বেই পান ও সিগারেট কিনিয়া রাখিয়াছিল; পান মুখে দিয়া, সিগারেট ধরাইয়া সম্মুখের বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া দিয়া যোগেশ আরাম করিতে লাগিল। আর তাহার সম্মুখে অভাগিনী, গৃহত্যাগিনী, মর্ম্মপীড়িতা, অনাথা, সুশীলা, বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহা সেই জানে, আর সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্‌ই জানেন।

[১৯]

মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিলে যোগেশ সুশীলাকে বলিল, "সুশীলা, এইখানে আমাদের গাড়ী বদল ক'রে কাশীর গাড়ীতে উঠ্‌তে হবে।" পূর্ব্বদিনের অপরাহ্ণ, সমস্তরাত্রি, এবং এই দিনের বেলা দশটা পর্য্যন্ত যোগেশ কতবার সুশীলাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিছু খাই-বার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়াছে, সুশীলা তাহার কোন কথারই উত্তর দেয় নাই। সে যে ভাবে শয়ন করিয়া ছিল, মৃতবৎ সেই ভাবেই কাটাইয়াছে; একবারও সে উঠিয়া বসে নাই। কত যাত্রী গাড়ীতে উঠিল, কত যাত্রী গাড়ী হইতে নামিল; কত জনের কত কোলাহলে, গল্পগুজবে, বাক্‌বিতণ্ডায় গাড়ীখানি মুখর হইল, কিন্তু সুশীলা যে সে সকল কথা শুনিতেছে, তাহার সামান্য প্রমাণও পাওয়া গেল না।

মোগলসরাই ষ্টেসনে যোগেশ যখন তাহাকে নামিতে বলিল, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তাহার বিবর্ণ মুখশ্রী ও আরক্ত-লোচন দেখিয়া যোগেশ ভীত

হইল। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সুশীলা মোটেই নিদ্রা যায় নাই,—সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। তাহার এই ভাব দেখিয়া যোগেশ আর কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না। যে যখন তাহার বাক্স বিছানা একটা কুলীর মাথায় তুলিয়া দিল, তখন সুশীলা আপনা হইতেই গাড়ী হইতে নামিয়া যোগেশের পশ্চাদনুসরণ করিল। নিকটেই আর একটি প্লাট্ফরমে কাশীর গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেশ প্রথমে জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিল, তাহার পর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সুশীলা সেই গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে স্ত্রীলোক দেখিয়া আর কেহ সে দিকে আসিল না। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী যখন গঙ্গার সেতুর উপরে উঠিল, তখন যোগেশ বলিল, "ঐ দেখ কাশী—এই গঙ্গা।" তখন নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গাড়ী হইতে "জয় বিশ্বনাথজি কি জয়" "জয় গঙ্গা-মাইকি জয়"-ধ্বনি উত্থিত হইল। এই ধ্বনি শুনিয়া সুশীলার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। সে অনুচ্চস্বরে বলিল, "জয় বিশ্বনাথজি কি জয়"; তাহার পর গলায় বস্ত্র দিয়া ছলছলচক্ষে প্রণাম করিল। যোগেশও সুশীলার দেখাদেখি প্রণাম করিল।

দেখিতে দেখিতে সেতুর অপরপার্শ্বস্থ কাশী-ষ্টেসনে গাড়ী থামিল।

যোগেশ কুলী ডাকিয়া বাক্স বিছানা তাহার মাথায় দিল এবং সুশীলাকে গাড়ী হইতে নামাইল। ষ্টেসনের বাহিরে উপস্থিত হইলে ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ান ও একাওয়ালারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল ;—দুইচারি জন পাণ্ডাও সেখানে উপস্থিত হইল। পাণ্ডাগণ প্রত্যেকেই যোগেশকে চাপিয়া ধরিল এবং নানাপ্রকার দোকানদারী আরম্ভ করিয়া দিল। অনেক কথা-কাটাকাটির পর যোগেশ একজন পাণ্ডা ঠিক করিল। পাণ্ডাজি অন্য একাওয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির একা ভাড়া করিল। একাওয়ালা যোগেশের জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সওয়ার হইতে বলিল।

সুশীলা এতক্ষণ দূরে একপার্শ্বে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেশ তাহার নিকট যাইয়া বলিল, "এস সুশীলা, গাড়ী-ভাড়া হয়েছে।"

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব ?"

যোগেশ। কেন সহরের মধ্যে।

সুশীলা। সহরে যেতে হয়, আমি একলা যাব—আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

যোগেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি কথা! তুমি পাগল হলে না কি!"

সুশীল। না—আমি পাগল হইনি। আমি ঠিক কথা বল্‌ছি—আমি তোমার সঙ্গে কাশী যাব না। যেতে হয়, তুমি চলে যাও—আমি আমার পথ দেখে নেব।

যোগেশ। তুমি কি পাগলের মত বক্‌ছ! এখানে তোমাকে জানে কে, চেনে কে? কে তোমাকে আশ্রয় দেবে? সঙ্গে টাকাকড়ি এনেছ বুঝি?

সুশীলা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "আমায় চেনে কে? আমায় জানে কে?—বাবা বিশ্বেশ্বর আমায় চেনেন—তিনি আমায় জানেন—তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন। যখন তাঁকে চিনিনি, তখন তোমার আশ্রয় চেয়েছিলুম। আগে তাঁকে চিন্‌লে তোমার আশ্রয় চাইতুম না। তুমি যাও, এখানে গোল করো না। তুমি যতক্ষণ এখানে আছ, ততক্ষণ আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না—এই আমি বস্‌লুম।" এই বলিয়া সুশীলা সেইস্থানে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

যোগেশ তখন কাতর হইয়া বলিল, "সুশীলা, তুমি কি বল্‌ছ, বুঝে দেখ। এখানে গোলমাল করলে, এখনই দশজন লোক এসে পড়বে, একটা কাণ্ড বেধে উঠবে; শেষে হয় ত দুজনকেই থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, বুঝতে পারছ ত?"

এই কথা শুনিয়া সুশীলার মনে ভয় হইল—সে উঠিয়া দাঁড়াইল—তারপর যোগেশকে বলিল, "বেশ, এখানে নাই থাক্‌লুম, আমি চলে যাচ্ছি—তুমি তোমার পথ দেখ—আমার সঙ্গে তুমি একটি কথাও কইতে পাবে না।"

যোগেশ বলিল, "সঙ্গে টাকাকড়ি আছে বুঝি, তাই অত জোর করছ। এ কাশী—বড় কঠিন ঠাঁই—এখনই জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে তোমার সব যাবে—শেষে পথেপথে ভিক্ষে করতে হবে।"

সুশীলা। এই একবস্ত্র ছাড়া আমার সঙ্গে একটি পয়সাও নেই—গায়ের গহনাগুলো পর্য্যন্ত খুলে রেখে এসেছি। তোমার সঙ্গে যখন কাশীতে এসেছি, তোমার কথায় ভুলে যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি—তখন ভিক্ষে করে যে খেতে হবে,—জানি-ই। আগে জান্‌লে এমন কাজ কর্‌তাম না। তোমায়

বল্‌ছি, তুমি যাও—আমি ভিক্ষা করেই খাব। তোমার অনুগ্রহ আমি চাইনে।”—এই বলিয়া সেই কপর্দ্দকহীনা, সহায়হীনা যুবতী এই বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে একাকিনী পথে বাহির হইয়া পড়িল।

যোগেশের পাণ্ডা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল;—সে সকল কথা শুনিতে না পাইলেও, যে দুই একটি কথা শুনিয়াছিল, তাহাতেই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছিল। কাশীর পাণ্ডাদের এ প্রকার ঘটনার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। এ শ্রেণীর যাত্রীর সহিত প্রায় সর্ব্বদাই তাহাদের দেখাশুনা হইয়া থাকে।

সে যোগেশকে বলিল, “বাবুজী, আপনি ভাব্‌ছেন কেন? আপনি একায় উঠে বসুন—একাওয়ালা আমার জানা লোক—তাকে আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি—সে আপনাকে আমার বাসায় পৌঁছিয়ে দেবে। আমি এখন এই ছুঁড়িটার পেছন নিই। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না—আমি ওকে ঠিক আপনার কাছে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা কাশীর পাণ্ডা, আমাদের অসাধ্য কি কাজ আছে! আপনি চলে যান—আমি আধঘণ্টার ভেতরে পাখী ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আর দাঁড়াব না—ছুঁড়ীটা তাহলে চোখের বা’র হয়ে যাবে।”

এই বলিয়া সে একাওয়ালাকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া সুশীলার অনুসরণ করিল। এ দিকে একা কাশী-সহরের দিকে দৌড়িল।

যে পাণ্ডা-মহাশয় সুশীলার অনুসরণ করিলেন, তাঁহার নাম রমানাথ চক্রবর্ত্তী। দেশে রমানাথের যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই আবকারীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া যখন একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িল, তখন সে তাহার সংসারের অবলম্বন একমাত্র বৃদ্ধা জননীকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে উপস্থিত হইল। রমানাথের শ্রেণীর লোক কাশীতে অন্নাভাবে কষ্ট পায় না। কাশীর ছত্রগুলি এই সকল লোকের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি সত্রে স্থান পায় না; কিন্তু রমানাথের ন্যায় গাঁজাখোর, মাতাল ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ মহাসুখে, নিশ্চিন্তমনে সত্রের সেবা গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় এবং পুণ্যধাম বারাণসীর পবিত্র দেহ কলঙ্কিত করে।

রমানাথের কাশীতে আসিবার কিছুদিন পরেই তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। এতদিন তবুও বৃদ্ধা মাতার জন্য তাহার একটু চিন্তা, একটু ভাবনা ছিল; এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল।

সত্রে আহার করে, আর যাত্রী ঠকাইয়া পাণ্ডাগিরি করে ;—পাণ্ডাগিরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার কিছু মদ, গাঁজায় উড়াইয়া দেয়, আর কিছু সঞ্চয় করে। অল্পদিনের মধ্যেই রমানাথ বেশ একজন নামজাদা পাণ্ডা হইয়া উঠিল। তখন সে বাঙ্গালীটোলায় একটি বাড়ী ভাড়া করিল ; একটি সঙ্গিনীও খুঁজিয়া লইল এবং যাত্রীদিগের কাশীকার্য্য করাইয়া বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। কাশীর প্রসিদ্ধ গুণ্ডা ও বদমাইস্‌দিগের সহিত তাহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল। রমানাথ কাশীর পাণ্ডাদলের দশজনের একজন হইল।

এই রমানাথ পাণ্ডার হাতেই যোগেশ ধরা দিয়াছিল এবং সুশীলা ধরা না দিয়া কাশীর রাজপথে একাকিনী বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে রমানাথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। কাশীর ন্যায় অপরিচিত স্থানে আসিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় সুশীলা বিশ্বনাথের নাম করিয়া মনে বল বাঁধিলেও, কাশীর এই জনাকীর্ণ রাজপথের একপার্শ্ব দিয়া অতিশয় সঙ্কোচের সহিত সে চলিতে লাগিল। একটু যাইতে না যাইতেই, রমানাথ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ষ্টেসনে অনেক পাণ্ডার সহিত যোগেশের কথাবার্ত্তা হইতেছিল এবং সুশীলাও সে দিকে তেমন-

ভাবে চাহিয়া দেখে নাই; কাজেই সে রমানাথকে চিনিতে পারিল না;—সে বুঝিতেও পারিল না যে, রমানাথ যোগেশেরই প্রেরিত লোক।

রমানাথ তখন নিতান্ত ভালমানুষের মত অত্যন্ত স্নেহ-পূর্ণ স্বরে সুশীলাকে বলিল, "মা, তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি কাশীতে আর কখনও এসনি। তুমি কি মা, একলাই এসেছ, না সঙ্গে আর কেউ আছে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পথ হারিয়েছ বা সঙ্গী হারিয়েছ। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, এই কাশীতেই থাকি; বাবার নাম করে বেড়াই, আর গরীব দুঃখী, অনাথা দেখ্‌লে, তাদের সেবা করি।—এই আমার কাজ। তোমার বয়স অল্প, আর তুমি একেলা যাচ্ছ দেখে, বাবা বিশ্বনাথই যেন আমায় ডেকে বল্লেন, 'যা বেটা, ঐ নিরাশ্রয় মেয়েটার সেবা কর'।

আজ দুই দিনের মধ্যে এমন স্নেহপূর্ণ স্বরে, এমন করিয়া কথা সুশীলাকে কেহ বলে নাই। রমানাথের কথা শুনিয়া, তাহার মনে হইল, তাহার কাতর-প্রার্থনা বিফল হয় নাই; বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে অসহায়া দেখিয়া তাহার সাহায্যের জন্যই এই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে তখন মুখ

তুলিয়া রমানাথের দিকে চাহিল। রমানাথ এ দৃষ্টির জন্য প্রস্তুতই ছিল। পাণ্ডাগিরি ব্যবসায়ে সে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সে তাহার মুখের ভাব এমনই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল যে, তাহাকে দেখিয়া সুশীলা তাহাকে নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, পরহিত-ব্রত, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করিল। সুশীলা তখন সেই রাজপথের পার্শ্বেই গলবস্ত্র হইয়া রমানাথকে প্রণাম করিল;—তাহার পর অনুচ্চস্বরে বলিল, "বাবা, আমি বড় দুঃখিনী। বড কষ্টে, বড় বিপদে পড়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শরণ নিতে এসেছি। সঙ্গে কেউ নেই, কিছুই নেই, বল ভরসা শুধুই বাবা বিশ্বনাথ। কাল সারারাত্রি গাড়ীতে পড়ে আমি একমনে বাবাকে ডেকেছি। তিনিই দয়া ক'রে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনি বাঙ্গালী, আপনি ব্রাহ্মণ—আমিও বাঙ্গালীর মেয়ে। আমাকে আপনি একটু আশ্রয় দেবেন। আমি আপনার ঘরে দাসীবৃত্তি করব। আর কিছুই চাইনে।"

রমানাথ বলিল, "মা, রাস্তায় এত লোক চল্‌ছে, কই কারও দিকে ত আমার দৃষ্টি পড়ল না! বাবা বিশ্বনাথই আমার প্রাণের ভিতর থেকে তোমাকে সাহায্য কর্‌বার

হুকুম করলেন। তোমায় জানিও নে, চিনিও নে, শুধু বাবার হুকুমেই তোমার কাছে এসেছি। তোমার কোনও ভয় নাই মা—আমার সঙ্গে চল। এখানে আমার বাসা আছে; সেখানেই তুমি থাকবে। তোমাকে দাসীবৃত্তিও কর্‌তে হবে না, ভিক্ষে কর্‌তেও হবে না। এই গরীব ব্রাহ্মণের উপর বাবার হুকুম। তিনিই এই গরীবের হাত দিয়ে তোমার আহার জুটিয়ে দেবেন। বাবার এই সোনার কাশীতে এলে কেউ আহারের কষ্ট পায় না—চাই শুধু ভক্তি। বাবা বিশ্বনাথ! তোমারই ইচ্ছা। ব্যোম—ব্যোম্—শিব—শিব!"

রমানাথের এমন সুন্দর, এমন ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া সুশীলার প্রাণ শীতল হইয়া গেল; বাবা বিশ্বনাথ যে তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন. এ বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হইল। সে তখন বলিল, "বাবা, আমি বিধবা, আমি কায়স্থের মেয়ে, আমি জ্ঞান স্বরূপে কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই; বড় কষ্টে পড়ে বাবার ধামে এসেছি। যদি কোন দিন সময় হয়, তখন আপনাকে সব বল্‌ব। আপনি আমাকে আপনার মেয়ের মত দেখবেন। আমার কাছে

একটী পয়সাও নেই, দ্বিতীয় কাপড়খানি পর্য্যন্তও নেই। আমি—”

তাহার কথায় বাধা দিয়া রমানাথ বলিল “মা, কিছু ভেব না, তোমাকে ত বলেছি, বাবার হুকুম! বাবার হুকুমে আমি তোমার সব ক'রে দেব, তুমি আমার মেয়ের মত থাকবে। তা দেখ, এখান থেকে বাঙ্গালীটোলা অনেক দূর। তুমি ভদ্র-গৃহস্থের মেয়ে; তোমার ত পথচলা অভ্যাস নেই। একখানি গাড়িভাড়া করে তোমাকে বাসায় নিয়ে যাই।”

সুশীলা বলিল “বাবা, আমি আপনার সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারব; গাড়ীভাড়ার পয়সা ত আমার কাছে নেই।”

রমানাথ বলিল “আরে পাগলী মেয়ে, তোমাকে গাড়ী ভাড়া দিতে হবে কেন? বাবার কৃপায় আটগণ্ডা পয়সা গাড়ী-ভাড়া দেওয়ার সংস্থান রমানাথ চক্রবর্ত্তীর আছে।”

সুশীলার নিকট রমানাথ নিজের নাম বলিতে দ্বিধাবোধ করিল না, কারণ সে জানিতে পারিয়াছিল যে, সুশীলা কাশীর কোন খবরই জানে না, রমানাথ চক্রবর্ত্তী যে কেমন জীব, তাহাও সে জানে না।

রমানাথ তখন একখানি ঘোড়ারগাড়ী ডাকিয়া সুশীলাকে

তাহাতে চড়াইল এবং নিজেও সেই গাড়ীতে উঠিয়া সম্মুখ দিকের আসনে বসিল। তাহার পর রাস্তায় যাইতে যাইতে রমানাথ সুশীলাকে নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিল।

একটু পরেই গাড়ী একটা সরু গলির মোড়ের নিকট দাঁড়াইল। রমানাথ গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিল; তাহার পর সুশীলার দিকে ফিরিয়া বলিল "মা, তুমি গাড়ীতে একটু অপেক্ষা কর, আমি বাড়ীতে খবর দিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া রমানাথ সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার অভিপ্রায় এই যে, সুশীলা তাহার বাড়ীতে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া যদি সেখানে যোগেশকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে হয় ত একটা গণ্ডগোল বাধাইতে পারে। তাই যোগেশকে তখনকার মত একটু গোপন থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্যই সে সুশীলাকে গাড়ীতে রাখিয়া আগে নিজে বাড়ীতে আসিল।

রমানাথ তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়াই দেখে যোগেশ বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। রমানাথ আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিল "কাজ হাসিল্! কিন্তু বাবু, আপনাকে এখন একটু গোপন থাকতে হবে। আমার ঐ তেতালায় একটা ঘর আছে, সেখানে

আপনি যান; আপনার জিনিষপত্রও সেখানে নিয়ে যান। আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেব। আপনি দোতালায় এখন নামবেন না; আমি আপনার সব কাজ আজই রাত্রির মধ্যে গুছিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম রমানাথ চক্রবর্ত্তী,—কাশীতে আমার অসাধ্য কাজ নেই বাবু! কত কৌশল করে যে মেয়েটীকে ফাঁদে ফেলেছি, তা আর কি বল্‌ব। একশখানি টাকার কমে এ জিনিস আপনার হাতে দিচ্ছিনে বাবু!"

এই বলিয়াই রমানাথ যোগেশের দ্রব্যাদি তেতালার ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং নিজের কাশী-সঙ্গিনীকে তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রমানাথ বাসার বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই সুশীলাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

সুশীলাকে দ্বিতলে লইয়া গিয়া রমানাথ বলিল "মা, এই ঘরে তুমি থাক্‌বে। আমার একজন রাঁধুনী-বাম্‌নী আছে, সেই রান্না কর্‌ছে। তুমি বিধবা, তোমার জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; বামনীই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে আন্‌বে। এখানে তোমার কোন অসু-বিধা বা কোন কষ্ট হবে না।" এই বলিয়া রমানাথ সমস্ত

ব্যবস্থা করিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুশীলা রমা-নাথের প্রদর্শিত ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখে, সেখানে একখানি মাদুর বিছানো রহিয়াছে। সুশীলা সেই মাদুরে বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই রমানাথের বামুনী ওরফে গৃহসঙ্গিনী আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বামুনঠাকুরাণীর বয়স ২৫।২৬ বৎসর। দেখিতে কুৎসিতা নহে, দেখিলে গৃহস্থের মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। ইহার অধিক পরিচয় দিবার বা বর্ণনা করিবার আর কোনও প্রয়োজন দেখি না। বামুনী বলিল, "ওগো বাছা, চুপটি ক'রে বসে আছ কেন? বেলা ত কম হয়নি—আমার রান্নাবান্না সব হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর তোমাকে গঙ্গা-স্নান করিয়ে আন্‌তে বল্‌লেন। চল, তোমাকে নাইয়ে নিয়ে আসি। তোমার নামটি কি ভাই?"

বামুনঠাকুরাণীর আকার প্রকার, হাব ভাব, পরণপরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা কিছুই সুশীলার নিকট ভাল বোধ হইল না। সুশীলার মনে এতক্ষণ যে শান্তির ভাব ছিল, এই বামুন-ঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাহা যেন একটু নড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে এ কোথায় আসিল! এ স্থান, এ বাড়ী, এ স্ত্রীলোকটি কিছুই তাহার নিকট ভাল ঠেকিল না। কিন্তু

একাকিনী নিরাশ্রয়া—সে কি করিবে? বিশ্বনাথের চরণতলে আসিয়া তাহার মনে যে নির্ভরের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যেন একটু কাঁপিয়া গেল। তাহার মনে নানা চিন্তা, নানা ভয়ের উদয় হইল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বামুনঠাকুরাণী বলিল, "ওগো মেয়েটি, বসে বসে ভাব্‌ছ কি? ওঠো, নাওয়া খাওয়া ত করতে হবে? তার পর সারাদিন আছে, সারারাত আছো বসে বসে ভেব। তোমার নামটা কি?"

সুশীলা নতমস্তকে বলিল, "আমার নাম সুশীলা, আমি কায়স্থের মেয়ে—আমি বিধবা"।

বামুনঠাকুরাণী একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ওগো, অত পরিচয়ে এখন দরকার নেই। ওঠ, বেলা হ'ল, তোমাকে নাইয়ে এনে আমি কাযকর্ম্ম সব সেরে ফেলি; সারাদিন এই নিয়েই থাকি আর কি!"

সুশীলা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বামুন-ঠাকুরাণী বলিল, "কই, তোমার কাপড়, গামোছা কই?"

সুশীলা বলিল, "আমার সঙ্গে ত কাপড় গামোছা কিছুই নেই।"

বামুনঠাকুরাণী বলিল, "ও তা ত বটেই! তোমার এখানে যে কিছুই দেখ্‌ছিনে। তোমার সব—উপরে বুঝি তোমার বাবুর কাছে রয়েছে?"

সুশীলা বলিল, "বাবু! বাবু কে? আমার সঙ্গে ত কেউ নেই।"

বামুনঠাকুরাণী বলিল—"ও—আমি মনে করেছিলুম, তেতলায় যে বাবুটি এসেছেন, তুমি বুঝি তাঁরই সঙ্গে এসেছ!"

সুশীলা কাতরভাবে বলিল, "না বাছা, আমি কারও সঙ্গে আসিনি—আমি একলাই এসেছি। আমার সঙ্গে কিছু নেই দেখে, ঠাকুর-মহাশয় দয়া ক'রে আমাকে পথথেকে কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বড় দুঃখিনী—বড় অভাগী!"

কথাগুলি বামুনঠাকুরাণীর ভাল লাগিল না। সে মুখখানি একটু বিকৃত করিয়া, একটু সুর টানিয়া বলিল, "কি জানি বাবু, তুমি কে! তা যাই ঠাকুরের কাছে। তিনি তোমার কাপড়, গামোছার কি করবেন, তাই শুনিগে। যত সব গেরো!"

বলা বাহুল্য, সুন্দরী, যুবতী, বিধবা সুশীলাকে দেখিয়া ঠাকুরাণীর হৃদয়ে স্বতঃই ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। সে আর কিছুতেই তাহা গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না।

বামুনঠাকুরাণী চলিয়া গেলে, সুশীলা আবার সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে তখন একটা ভয়ানক দুর্ভাবনার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল—"একটু আগেই একটি বাবু এসেছেন—তিনি তেতলায় আছেন। এ বাবু ত যোগেশ নহে ?" কথাটা মনে করিতেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। "তবে কি রমানাথ-ঠাকুর তাহাকে ফাঁদে ফেলিলেন ?—না—না, তাহা বিশ্বাস হয় না। ঠাকুর এমন খারাপ লোক হইতেই পারেন না। তাঁহাকে দেখিলে খারাপ লোক ব'লে মনেই হয় না। এমন দয়ার শরীর ;—না না, আমি তাঁকে সন্দেহ করব না। কাশীতে কত লোক আছে ;—আজ আমরা যে গাড়ীতে এলুম, তাতেও কত যাত্রী এল—কত মেয়ে, কত পুরুষ, কত বাবু এল ; হয় ত তাদের কেউ একজন এসে এই বাড়ীর তেতলায় বাসা নিয়েছেন।"

এই সময়ে বামুন-ঠাকুরাণী একখানি কালপেড়ে ধুতি ও একখানি নূতন গামোছা আনিয়া সুশীলার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও, বাবু—না—না ঠাকুরমশাই, তোমাকে এই কাপড় আর এই গামোছাখানি দিলেন। চল, আর দেরী ক'র না, শীগ্‌গির তোমায় নাইয়ে নিয়ে আসি।"

সুশীলা হাত বাড়াইয়া কাপড় ও গামোছা লইল এবং ধীরে ধীরে বামুনঠাকুরাণীর অনুসরণ করিল। গঙ্গা নিকটেই ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুশীলা স্নানাদি শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার পর বামুনঠাকুরাণী সুশীলার জন্য ভাত তরকারি পরিবেশন করিয়া তাহাকে রান্নাঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

সুশীলা আহারে বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বামুনঠাকুরাণী বলিল, "ওগো, ভাবছ কি? খেতে বস, ও সবই নিরামিষ। বেশীদিন আর ও সব ন্যাকামী করতে হবে না। আমরাও প্রথম প্রথম এসে ২।১ দিন অমন লোক-দেখান অনেক করেছি। বলে—ঢাকে ঢোলে বিয়ে, কাঁসি বাজাতে বারণ।"

সুশীলা আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এই কথা শুনিয়াই পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বামুনঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কিছু খাব না।"

এই বলিয়াই সে দ্রুতপদে তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর ঘরের একমাত্র দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া, সে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল—তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল;—একবার শুধু বলিল "মাগো মা,—তুমি কোথায়?"

[২১]

কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিল যে, সুশীলা অনাহারে কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে, তখন সে তাহার রক্ষিতা ব্রাহ্মণীর উপর চটিয়া গেল ;—বলিল, "তুই তাকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিস্ ; তাই সে রাগ ক'রে খায়নি।

বামুনী বলিল ; "আমি তাকে কি বলতে যাব ! তার সঙ্গে কথা বল্‌বার বা ঝগড়া করবার আমার কি দায় পড়ে গেছে ! আমি তারে ভাত খেতে ডাকলুম ; সে রাগ করে, বলল, 'খাব না', আর তারপরেই ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিলে। সে কি আমার মা না মাসী যে, সাধাসাধি কর্‌তে যাব ! সাধ্‌তে হয়, পায়ে ধর্‌তে হয়, মান ভাঙ্গাতে হয়, তুই যা বামনা !'

রমানাথ বলিল, "দ্যাখ শ্যামা, আমাকে রাগাস্‌নে বলছি। আমি কিসের জন্যে কি করি, তা বুঝতে তোর ঢের দেরী আছে। মেয়েমানুষের রূপ দেখে ভুলবার দিন আমার অনেককাল চ'লে গেছে। এখন ঘুরি ফিরি শুধু পয়সা রোজ-

গায়ের ফিকিরে। শুন্‌বি মজাটা ;—ঐ যে বাবুটি এসেছে, ওই ভুলিয়ে ভালিয়ে মিথ্যাকথা ব'লে ছুঁড়িটাকে নিয়ে সটান কাশী চলে এসেছে। ছুঁড়িটা পথের মধ্যে ওর মতলব বুঝ্‌তে পেরে বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। কাশীতে নেমে ছোঁড়াটা একদিক চলে যায়, ছুঁড়ীটা আর একদিক চলে যায়। এই না দেখে, আমি ছোঁড়াটাকে চুপ ক'রে একখানি এক্কাভাড়া করে এখানে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর মেয়েটার সঙ্গ নিয়ে, নানা কথা বলে, নানা রকম বুঝিয়ে, তাকে এখানে এনে ফেলেছি। মেয়েটা জানে না বাবুটি এখানে আছে! তাহলে কি আর সে এখানে আস্‌ত! তুই হয় ত কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছিস্‌, মেয়েটার তাই সন্দেহ হয়েছে! তোর যেমন বুদ্ধি!"

ক্ষ্যামা বলিল, "তা তোরই বা কি আক্কেল! সব কথা খুলে বলে গেলেনি কেন? আমি জানি, জাত কূল মজিয়ে আর দশজন মেয়ে যেমন কাশীতে আসে—এই ধর না আমিই যেমন এসেছিলুম—ওটাও তেমনি একটা মেয়ে। বাবা, এর মধ্যে যে, আবার সতীগিরি আছে, তা জান্‌ব কি করে!"

"তাই বুঝি তুই রসিকতা কর্‌তে গিয়েছিলি?"

"ভারী আমার কুটুম কি না, তাই রসিকতা কর্‌তে গিয়েছিলুম!—আর ত লোক খুঁজে পেলুম না!"

"আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, তুই কিছু বলেছিস্! নইলে কথা নাই, বার্ত্তা নাই, থামাকা সে রাগ করে বস্‌ল!"

"বলে থাকি, বলেছি,—বেশ করেছি। চোক-রাঙ্গানী দেখ না! যত সব গেরস্তর মেয়ে এনে তাদের জাতকুল মারবেন—আর সেইকথা বল্‌তে গেলে চোক-রাঙ্গানী। যা যা, তোর মত অনেক বামুন দেখেছি—অনেক গরু চরিয়ে এসেছি—এখন আর তোর ধম্‌কানি সইতে পারিনে। অমন কর্‌বি ত আমি এ্যাক্‌খুনি চলে যাব। কতজন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধাসাধি কর্‌ছে। আমি মনে মনে ভাবি কি—আছি বামুনটার কাছে, থাকিই না কিছুদিন! তা তুই যে রকম বাড়াবাড়ি করছিস্, তাতে তোর এখানে থাকা আমার আর পোষাবে না।"

রমানাথ এই কথা শুনিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেল; চীৎকার করিয়া বলিল, "বেরো—বজ্জাত মাগী, আমার বাড়ী থেকে। যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

ক্ষ্যামাও ক্ষান্ত দিবার লোক নহে। সেও বলিয়া উঠিল, "মুখ সাম্‌লে কথা ক'স বামনা! এই চল্‌লুম তোর বাড়ী থেকে।"—এই বলিয়াই রাগে গরগর করিতে করিতে ক্ষ্যামা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ঘুমায় নাই। এ অবস্থায় ঘুমান তাহার পক্ষে অসম্ভব। রমানাথ বাড়ীতে আসিয়া, প্রথমেই যখন ক্ষ্যামার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুশীলা তখনই আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। রমানাথের সহিত ক্ষ্যামার যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সকলই সে শুনিয়াছিল। সুশীলা যদি এই সময়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ভাবিত, কাঁদিত, বা উপায় চিন্তা করিত, তাহা হইলে সেই রাত্রিতে তাহার অদৃষ্টে কি হইত তাহা বলা যায় না! কিন্তু সে সময়ে তাহার কি একটু বুদ্ধি যোগাইল। সে যখন বুঝিতে পারিল ক্ষ্যামা রাগ করিয়া সিঁড়ী দিয়া নামিয়া গেল, তখন সে ঐ ঘরের প্রান্তস্থিত রাস্তার দিকের জানালার নিকট গিয়া জানালাটি খুলিয়া ফেলিল। ঠিক সেই সময়ে ক্ষ্যামা জানালার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। সুশীলা অতি কাতরস্বরে ক্ষ্যামাকে ডাকিল।

ক্ষ্যামা ডাক শুনিয়া পার্শ্বের দিকে চাহিয়া দেখে, সুশীলা জানালা খুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সে জানালা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র সুশীলা ভীতস্বরে বলিল, "ক্ষ্যামা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষে কর, আমায় বাঁচাও।"

ক্ষ্যামা এই কথা শুনিয়া একটু ভাবিল, তার পর বলিল, "ওদের সঙ্গে কোন গোল ক'র না। ওরা যা বলে, তাই শুন, যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই কর—আর সন্ধ্যা-বেলা একটু ফাঁক্ পেলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এস—রাত নয়টা পর্য্যন্ত তোমার জন্য আমি এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ব।"—এই বলিয়াই ক্ষ্যামা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বিপদে পড়িলে অনেক বুদ্ধিমানও হতবুদ্ধি হইয়া যায়, আবার অনেক নির্বুদ্ধি লোকেরও কেমন একটা উপস্থিত-বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুশীলারও তাহাই হইল। সে গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—এ বিপদে তাহার হতবুদ্ধি হইবারই কথা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন এই বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের ফন্দী তাহার বুদ্ধিতে যোগাইল।

ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আর কর্ত্তব্য

নহে মনে করিয়া, সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল—দেখিল, রমানাথ বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়াই রমানাথ বলিল, "তুমি ভাত খেলে না যে?"

সুশীলা উত্তর করিল, "আপনার বামুনঠাকরুণ কিছু জিজ্ঞাসাপড়া না করেই ভাতের পাশে মাছ দিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে ভাত আর কি করে খাই! তাই ঘরে গিয়ে শুয়েছিলাম। [illegible] রেলে ঘুমা[illegible] হয়নি—অমনি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই দুয়োর খুলে শুন্‌তে এলুম, কি হয়েছে!"

রমানাথ সুশীলার এই কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল—বুঝিল সুশীলা কিছুই শুনিতে পায় নাই;—আরও বুঝিল ক্ষ্যামাও সুশীলাকে কিছু বলে নাই।

রমানাথ বলিল "তোমার কথা নিয়েই ত বাম্‌নীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল। আমি বল্‌লুম 'যে খাবে, তাকে জিজ্ঞাসা না করে মাছ দিতে তুই গেলি কেন? আর যখন শুন্‌লি যে, সে বিধবা, মাছ খায় না, তখন ফের রেঁধে দিলিনি কেন?' এই কথা নিয়েই বকাবকি হচ্ছিল। পয়সা দিয়ে লোক রাখব,

সে ঠিক ঠিক কাজ করবে না—বলতে গেলে চেঁচাবে—এমন লোক আমি চাইনে। তাই তাকে বিদেয় করে দিলুম। আমি এখনই যাচ্ছি। বামনীর অভাব কি! কিন্তু—তোমার যে সারাদিন কিছু খাওয়া হ'ল না, তার কি করা যায়। ঝিকে ডেকে দিই—সে রান্নার উয্যুগ করে দিক্, তুমি যা হয় দুটো রেঁধে নাও।"

সুশীলা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই অবেলায় আবার রাঁধতে যাই! আমরা বিধবা মানুষ, দুই একদিন উপবাসে আমাদের কিছুই কষ্ট হয় না।"

রমানাথ বলিল, "তা'হলে দোকান থেকে কিছু খাবার এনে দিক, তাই এখন খাও—সন্ধ্যার পর যা হয় করা যাবে।"

"দোকানের খাবার-টাবার আমি বড় খাই না। কিন্তু ফলটল যদি পাওয়া যেত, তা'হলে হ'ত। তা থাক, আপনাকে এখন কোন কষ্ট করতে হবে না। সন্ধ্যাবেলা একেবারে বিশ্বনাথের আরতি দেখে এসে, যা হয় একটা করে নেওয়া যাবে।"

রমানাথ বলিল, "তা'হলে তাই হবে। সন্ধ্যার সময়

তোমাকে বিশ্বনাথ দর্শনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর না হয় আমিই তোমার সঙ্গে যাব। ঝিকেও বলে রাথ্‌চি, সে তোমার সঙ্গে যাবে। আমার এখানে যখন এসেছ, তখন তোমার কোনও কষ্ট হবে না।"

সুশীলা বলিল "আপনার দেখ্‌ছি নানা কাজ; আপনি কেন কাজ ক্ষতি করে আমার সঙ্গে যাবেন? ঝি ত এখানকার পথঘাট সবই চেনে, তাকে সঙ্গে করেই আমি বিশ্বনাথ দর্শনে যাব।"

রমানাথেরও সে দিন সন্ধ্যার সময় আর একটি স্থানে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল, সেখানে আর যাইবে না—সুশীলাকেই চোখেচোখে রাখিবে এবং রাত্রিকালে তাহাকে বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিবে। এক্ষণে সুশীলার সহিত কথোপকথনে সে যখন দেখিল, সুশীলা তাহার অভিসন্ধি কিছুই জানিতে পারে নাই, তখন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন সে বোধ করিল না। সে তখন ঝিকে ডাকিয়া সুশীলার সঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শনে যাইবার কথা বলিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। সুশীলাও পলায়নের কোন বিঘ্ন

ঘটিবে না বুঝিয়া, তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল এবং কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবে—কতক্ষণে সে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ইহারই মধ্যে ২।৩ বার সে ঝিকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছে। ঝী তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ঠিক সময়ে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় যখন ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল, সেই সময়ে সুশীলা ঝির সঙ্গে পথে বাহির হইল। ঝী আগে আগে চলিল—সুশীলা তাহার পাছে পাছে যাইতে লাগিল। কয়েক-পা অগ্রসর হইয়াই সুশীলা দেখিল শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া শ্যামা হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিল এবং সেও তাহাদিগের অনুসরণ করিল।

ঝি আপন মনে চলিতেছিল। সে পিছনে ফিরিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। এইভাবে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্যামা সুশীলার আঁচল ধরিয়া টানিল। সুশীলা মুখ ফিরাইতেই শ্যামা বামপার্শ্বের গলির মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিবার ইঙ্গিত করিল। সুশীলা সম্মুখে চাহিয়া

দেখিল, ঝি আপন মনে চলিতেছে। তখন সে বামদিকের অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষ্যামাও তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সেই অন্ধকার গলির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

[২২]

সুশীলা যে পলায়ন করিবে, অথবা তাহার মনে যে কোন দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে, এ কথা তাহার সারাদিনের কথাবার্ত্তায় ঝি কেন, রমানাথও বুঝিতে পারে নাই; সুতরাং ঝি মোটেই সতর্ক হয় নাই।

যখন বাবা বিশ্বনাথের বাড়ীতে যাইবার জন্য সদর রাস্তা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকের রাস্তায় প্রবেশ করিতে হইবে, তখন ঝি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে সুশীলা নাই। সে মনে করিল, সুশীলা হয় ত পাছে পড়িয়াছে, সে নিজে হয় ত একটু দ্রুত-গতিতে আসিয়াছে। এই মনে করিয়া সে মোড়ের উপর একটু দাঁড়াইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, পথে তখন অসংখ্য লোক, রাস্তায় তখন জনতা। ঝি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুশীলার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু দুইতিন মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন সে সুশীলাকে দেখিতে পাইল না, তখন তাহার মনে ভয় হইল, হয় ত সুশীলা পথ হারাইয়াছে। সে তখন বাসার দিকে ফিরিতে আরম্ভ

করিল। রাস্তা দিয়া যত স্ত্রীলোক চলিতেছিল, সকলের দিকে চাহিতে চাহিতে সে বাসার দ্বার পর্য্যন্ত আসিল; কিন্তু সুশীলাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। বাসায় প্রবেশ করিয়া সুশীলার ঘর অনুসন্ধান করিল; উপরের তলায় যাইয়া বাবুটির ঘরের দিকে গেল, দেখিল সে ঘর বাহির হইতে তালাবন্ধ।

তখন ঝি মনে করিল, হয় ত সুশীলা তাহাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরেই আগে গিয়াছে, সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ঝি বেচারী তখন আবার বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে ছুটিল। পথের মধ্যে দেখিল একস্থানে পথের পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝি মনে করিল, সুশীলাই দাঁড়াইয়া আছে। সে তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "হ্যাঁগো, তুমি কেমন মেয়ে গা! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, আর আমি কি না তোমার জন্য সারা কাশীটা ঘুরে মর্‌ছি। ভাল মেয়ে যা হোক্!"

স্ত্রীলোকটি তাহার দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কে বাছা? আমি ত তোমাকে চিনিনে। তুমি আমাকে কি বল্‌ছ? তোমার বাছা ভুল হয়েছে।"

ঝি আরও একটু অগ্রসর লইয়া দেখিল,—না এ ত সুশীলা নহে। সে তখন বলিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা, আমার ভুলই হয়েছে। তা কিছু মনে কোরো না মা! বুড়া হয়েছি, অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাইনে। তাই তোমাকে আমাদের বাসার যাত্রী মনে করেছিলাম। তাই ত, এ মেয়েটা গেল কোথায়? এখন কি করি?"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বাছা তোমার?"

ঝি বলিল "আর কি হয়েছে মা! আজই বাসায় একটা বাবু, আর একটা মেয়ে এসেছিল। আমি সেই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ী আস্‌ছিলাম। মেয়েটা আমার পিছনে পিছনে ছিল, আমি আগে আগে আস্‌ছিলাম। একটু গিয়েই ফিরে চেয়ে দেখি, মেয়েটা নেই। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, ভাবলুম মেয়েটা হয় ত পিছনেই পড়েছে। তারপর তাকে খুঁজতে খুঁজতে বাসা পর্য্যন্ত গেলাম। রাস্তায়ও নেই, বাসায়ও নেই। বল দেখি মা! এখন কি করি, কোথায় যাই। ঠাকুর এ কথা শুনলে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে। ভাল বিপদে পড়া গেল!"

স্ত্রীলোকটি বলিল "তা, খুজে দেখ মা! নূতন

মানুষ, এই কাশীর রাস্তা। এখানে বিপদ ত পায় পায়। তা মা, ভাল ক'রে খুজে দেখ, বাবার বাড়ীতে দেখ; নৈলে আর কোথায় যাবে।"

ঝি তখন তাড়াতাড়ি বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিল। সেখানে কি আর খুঁজিবার যো আছে। বিশ্বনাথের আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লোকারণ্য! তাহার মধ্যে কি আর চলাফেরা করা যায়। ঝি নাটমন্দিরের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আরতি শেষ হইবার একটু পূর্ব্বেই ঝি দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আরতি শেষ হইয়া গেল; লোকজন বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু সুশীলার মত কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না।

ঝি তখন আর কি করিবে? ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল। ঠাকুরকে সে বিলক্ষণ জানিত। মেয়েটাকে পাওয়া যাইতেছে না, শুনিলে ঠাকুর যে কি করিবে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এই দুপুর বেলাতেই ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শ্যামা চলিয়া গিয়াছে; তাহার পর এখন আবার এই ব্যাপার। ঝি বুঝিল, আজ তাহার চাকরী যাইবে।

এই প্রকার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঝি বাসায় ফিরিয়া আসিল। বাসার মধ্যে প্রবেশ করিতেই—রমানাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রমানাথ ঝিকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া বলিল "কৈ, সে মেয়েটি কৈ ?"

ঝি রাস্তা হইতেই মতলব ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল "আর সে মেয়ে! আমি যে প্রাণে বেঁচে এসেছি, এই ভাগ্যি, ও গো, এই আমার ভাগ্যি !"

রমানাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কি, ব্যাপার কি ? হয়েছে কি ?"

ঝি বলিল "হবে আমার মাথা! বাবা, এমন মেয়েকেও সঙ্গে দেয়। আগে যদি জান্‌তাম যে, এমন হবে, তা হ'লে কি আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুই। কে জানে বাবু, মেয়েটার উপর যে এত লোকের চোখ ছিল, তা কি আমি জান্‌তাম। আর সে মেয়েটাই কি সামান্তি! তোমারও ঠাকুর, খেয়েদেয়ে কাজ নেই, একটা বজ্জাত মাগীকে এনে বাড়ীতে তুলেছিলে।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া রমানাথ বলিল "আরে মোলো, কি হয়েছে—তাই বল্‌না। তা না, হেন-তেন, মহাভারত আরম্ভ করে দিলি।"

১৪৫]

ঝি বলিল "বাবা, সে কি যেমন-তেমন মেয়ে! তার সঙ্গে লোক ছিল গো, লোক ছিল। শুন্‌বে, কি হয়েছে? আমরা ত বাসা থেকে বেরুলেম। মেয়েটা কখনও কাশীতে আসে নেই মনে করে, তাকে আগে-আগে ক'রে নিয়ে পথ দিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। একটু এগুতে না এগুতেই দুই-তিনটি লোক এসে পড়ল। মেয়েটা তাদের দেখেই বল্লে কি না 'ঝি, আমি আর তোমার সঙ্গে বাবার দর্শনে যাব না। আমার সঙ্গের লোক পেয়েছি, আমি তাদের সঙ্গেই যাব; তুমি ফিরে যাও।' এই কথা শুনে আমি ত অবাক্! আমি বল্‌লাম 'সে কি কথা গো! ঠাকুর তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন; আমি কি তোমাকে ছাড়তে পারি। তোমার কোথাও যেতে হয়, বাসায় চল; ঠাকুরকে ব'লে যেখানে যেতে হয় যেও।' এই কথা বলা, আর অমনি সেই লোক-গুলো আমাকে এই মারে ত এই মারে। একজন লাঠি তুলে বল্‌লে 'ফের কথা কবি, ত মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌ব।' শুনেই ত আমার বুক কাঁপতে লাগ্‌ল। কাশীর গুণ্ডা! বাবা, ওরা না কর্‌তে পারে এমন কাজ নেই। আমি তখন তাদের কত বল্‌লাম, তোমার নাম ক'রে ভয় দেখালাম;

বল্‌লাম 'জান না তোমরা, কাজ সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছ। এ যে সে লোক নয়—রমানাথ ঠাকুর।' আমার এই কথা শুনে একজন রেগে বল্‌ল 'আরে রেখে দে তোর রমানাথ ঠাকুর। অমন ঢের ঢের রমানাথকে দেখেছি। চল গো, আর দেরী করো না।' তখন আমি আর কি করব। কত বল্‌লাম, তারা কিছুতেই শুন্‌ল না; মেয়েটাকে নিয়ে তারা চলে গেল। আর মেয়েটাও তাদের সঙ্গে বেশ হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। তখন আমি আর কি করি? তোমাকে খবর দেবার জন্য বাসায় এলাম। দেখি, তুমি বাসায় নেই। মনে করলাম, তুমি হয় ত বাবার আরতি দেখ্‌তে গিয়েছ; তাই মনে ক'রে বাবার বাড়ী গেলাম। তোমাকে কত খুঁজতে লাগ্‌লাম। তোমার দেখা নেই। শেষে আর কি করি, বাবার আরতি হ'য়ে গেলে এই আস্‌ছি।"

রমানাথ এই সকল কথা শুনিতেছিল, আর রাগে ফুলিতেছিল; শেষে বলিল, "আচ্ছা, সে বেটাদের তুমি আর কখন দেখেছ?"

ঝি বলিল "না বাবা, তাদের আমি কাশীতে কখনও দেখি নি।"

রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "কাশীতে আমার হাত এড়িয়ে যাবে, এমন সাধ্য কারু নেই। এই রাত্রিতেই তাকে খুজে বার করব। রমানাথের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, সাধ্যি কার।" এই বলিয়া রমানাথ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ঝি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

[২৩]

সুশীলা ক্ষ্যামার সহিত একটা অন্ধকারময় গলিতে প্রবেশ করিল। দুইজনে তাড়াতাড়ি কিছুদূর অগ্রসর হইল। কাহারও মুখে কথা নাই। ক্ষ্যামা আগে আগে যাইতেছে, সুশীলা তাহার অনুসরণ করিতেছে। প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত চলিয়া, নানা গলি অতিক্রম করিয়া ক্ষ্যামা একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল; সুশীলাও তাহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল।

সুশীলা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নীরবে ক্ষ্যামার অনুসরণ করিয়াছে। এখন তাহাকে এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া সুশীলা বলিল "ক্ষ্যামা, এটা কার বাড়ী?"

ক্ষ্যামা বলিল "আমারই বাড়ী।"

সুশীলা বলিল "তুমি কি এই বাড়ীতেই থাক?"

ক্ষ্যামা বলিল "না, আমি এ বাড়ীতে থাকি না। হাতে যা কিছু ছিল, তাই দিয়ে এ বাড়ীখানি কিনেছি। এটা আমি যখন-তখন যাত্রীদের ভাড়া দিই; বারমেসে ভাড়াটে রাখি না। যারা ২।৪ দিনের জন্য কাশীতে আসে, তাদেরই এই বাড়ী

ভাড়া দিই। আমি এ দিকেই থাকিনে; আমার বাসা কেশী-ঘাটের কাছে।"

সুশীলা বলিল "তা হ'লে আমি এখানে একলা কেমন করে থাকৃব।"

ক্ষ্যামা বলিল "তোমাকে একলা থাকৃতে হবে কেন? আমিও থাকৃব। আজ কি আর বাসায় যাবার যো আছে। বামুনটা যে আমার বাসা জানে। সে হয় ত এতক্ষণ আমার খোঁজে সেই বাসায় গিয়েছে; সেখানে কি আজ আর যাই।"

সুশীলা দেখিল বাড়ীটির বাহির হইতে তালাবন্ধ। গলিটি যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনই অন্ধকার। তাহার পর সে পথে একটি লোকেরও চলাচল নাই। সুশীলার ভয় হইল; কিন্তু তখন আর উপায় নাই!

সুশীলা বলিল "ঠাকুর যদি খুজতে খুজতে এই বাড়ীতে আসে। এখানে যে তোমার একটা বাড়ী আছে, ঠাকুর কি তা জানে না?"

ক্ষ্যামা বলিল "পাগল আর কি! আমি যে এই বাড়ী কিনেছি, এই বাড়ী ভাড়া দিই, ঠাকুর তার কিছুই জানে না। তাকে কি আর আমি সকল কথা বলেছি! তোমার কোন

ভয় নেই। ঠাকুর ত ঠাকুর, যমও পথ চিনে এ বাড়ীতে আস্‌তে পারে না। আর পথে দাঁড়িয়ে থেক না, কি জানি কে এদিকে আস্‌বে, আর তোমাকে দেখে ফেল্‌বে। ভিতরে এস।"

এই কথা শুনিয়া সুশীলা তাড়াতাড়ি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; ক্ষ্যামা সদর-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার; কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশীলা দাঁড়াইল; বলিল "ও ক্ষ্যামা, আমি যে পথ দেখ্‌তে পাইনে।"

ক্ষ্যামা বলিল "একটু দাঁড়াও, আমি ঘর খুলে আলো জ্বালি; তার পর তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।" এই বলিয়া ক্ষ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল; সুশীলা সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল!

ক্ষ্যামা বেশী বিলম্ব করিল না; একটু পরেই একটা প্রদীপ হাতে করিয়া সুশীলার নিকট আসিল। সুশীলা সেই প্রদীপের আলোকে দেখিল যে, বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র; নীচে দুইখানি ঘর; উপরেও একখানি ঘর আছে বলিয়া তাহার মনে হইল।

ক্ষ্যামা বলিল "এই আমার বাড়ী। এখানে তুমি

থাকলে কেউ তোমাকে খুঁজে বা'র করতে পারবে না। এস উপরের ঘরে যাই।" এই বলিয়া ক্ষ্যামা প্রদীপ হাতে করিয়া আগে আগে চলিল, সুশীলা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। একটা অতি অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া দুইজনে উপরে উঠিল। সুশীলা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই। উপরে একটীমাত্র ঘর, আর তাহারই পাশে একটু খোলা-ছাত। সুশীলা ঘরের মধ্যে না গিয়া সেই ছাতে বসিয়া পড়িল। পূর্ব্বদিন অনাহার গিয়াছে, সারারাত্রি গাড়ীতে সে ঘুমাইতে পারে নাই; তাহার পর এ দিনও অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় আটটা। এই দুই দিন তাহার পেটে একবিন্দু জলও পড়ে নাই। দুই দিনের এই কষ্টে, আর অভাবনীয় বিপদে তাহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহাকে ছাতের উপর বসিয়া পড়িতে দেখিয়া ক্ষ্যামা বলিল "ওগো, ওখানে অমন ক'রে বসলে কেন? ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় বস। তার পর খাওয়া দাওয়াও ত করতে হবে। আজ সারাদিন তোমার নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই,—আমি ঠাকুরের ওখান থেকে বেরিয়ে এলে তুমি কি জলটল কিছু খেয়েছিলে?"

সুশীলা বলিল "না, কিছুই খাই নাই ; আজ আর কিছু খাবও না। একটু গঙ্গাজল পেলে তাই খেতাম।"

ক্ষ্যামা বলিল "সে কি কথা? না খেয়ে থাক্‌বে কেন? অবিশ্যি এতরাত্রে আর রান্নাবান্নার জোগাড় হয়ে উঠ্‌বে না। দোকান থেকে জলখাবার এনে দিই ; গঙ্গাজল ঘরেই আছে। তাই খেয়ে দুইজনে রাতটা কাটিয়ে দিই ; তার পর কা'ল সকালে উঠে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুশীলা বলিল "জলখাবার কিন্‌বার পয়সাই বা কোথায় পাব, কা'ল রান্নার যোগাড়ই বা কি দিয়ে কর্‌বে। আমার কাছে ত একটা তামার পয়সাও নেই ; আমি যে পথের ভিখারিণী ; আমার যে দ্বিতীয় বস্ত্রখানিও নেই ক্ষ্যামা!" এই বলিয়া সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষ্যামা বলিল "আহা, কাঁদ্‌ছ কেন? যা হবার তা হয়ে গিয়েছে ; সে সব ত আর ফিরে আস্‌বে না ; তবে আর মনকে কষ্ট দেও কেন? আর পয়সা-কড়ির কথা যা বল্‌লে, তার জন্য ভাবনা কি? আমি ঝি, আর একটা বিধবাকে দু-দশদিন দুটো হবিষ্যি যোগাতে পারিনে, মনে কর? দু'চারদিন থাক্‌তে

থাক্‌তেই তোমার পথ তুমিই ক'রে নিতে পার্‌বে—এক বাবু ছেড়ে এসেছ, দশটা বাবু জুটবে।"

সুশীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল—ক্ষ্যামা বলে কি? সে তাকে কি মনে করিয়াছে? সুশীলা কাতরস্বরে বলিল "ক্ষ্যামা, তুমি আমার মা। আমার বাবু ত নেই! আমি ত কোন বাবুর কাছে ছিলাম না। ক্ষ্যামা, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ; আমি ঘর ছেড়ে এসেছি বটে, আমি ত ধর্ম্ম হারাই নেই! মা—মাগো!" সুশীলা আর কথা বলিতে পারিল না—তাহার যে তখন কি অবস্থা, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য!

সুশীলাকে আবার কাঁদিতে দেখিয়া ক্ষ্যামা বলিল "ওগো কেঁদ না, চুপ কর। কাঁদ্‌বার সময় অনেক পাবে। এখন ওঠ, হাতে মুখে জল দেও, তার পর কিছু খাও। এই গলির মোড়েই দোকান আছে; আমি সেখান থেকে খাবার নিয়ে আস্‌ছি। তুমি হাতেমুখে জল দিয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে বস্‌লে তবে আমি দোকানে যেতে পারি।"

সুশীলা কাতরস্বরে বলিল "আমি একলা কেমন ক'রে থাক্‌ব। না ক্ষ্যামা, তোমার দোকানে গিয়ে কাজ নেই; আমি আজ কিছুই খাব না, আমাকে স্বধু একটু গঙ্গাজল এনে দাও।"

ক্ষ্যামা বলিল "তুমি যেন খাবে না, আমার ত কিছু খেতে হবে; আমারও যে আজ সারাদিন খাওয়া হয় নেই। সেই ঠাকুরের ওখান থেকে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে বেরিয়ে ঘরে গেলাম। তখন আর রাঁধে কে? আর তোমার কথা ভেবে মনটাও বড় খারাপ হ'ল; তাই চুপ ক'রে শুয়ে থাকলাম। তার পর এই সন্ধ্যা হ'তেই তোমার উদ্ধারের জন্য ছুটে আসতে হলো; আর কিছু মুখে দেওয়া হোল না।"

সুশীলা এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল "আহা, আমার জন্যে তোমার আজ সারাদিন খাওয়া হয় নাই ক্ষ্যামা! সে কথা ত আমি জানতাম না। তাহ'লে তুমি আর দেরী কোরো না। চল, আমি দুয়ারটা বন্ধ করে আসি, তুমি শীগ্‌গীর গিয়ে খাবার নিয়ে এস; আমি ততক্ষণ হাতমুখে জল দিয়ে নিই। ক্ষ্যামা, কি করব দিদি, আমার কাছে ত একটা পয়সাও নেই যে, পয়সা হাতে দিই। আমার জন্য তুমি যা করলে, তা আর কি ক'রে শোধ করব; যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না; আজ তুমি আমার যে উপকার করলে, তা—"

সুশীলার কথায় বাধা দিয়া ক্ষ্যামা বলিল "আহা, তুমি অত কাতর হচ্ছ কেন। মানুষের চিরদিনই কি এক অবস্থা

থাকে? তা আর দেরী করো না। ঘরের মধ্যেই জল আছে, ঘটিও আছে। ও গঙ্গাজল, আমি নিজে এনে রেখেছি। নীচের দোর আর বন্ধ করতে হবে না; আমি যাব, আর আসব। তুমি হাতে মুখে জল দিয়ে নেও।" এই বলিয়া ক্ষ্যামা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলা বলিল "সিঁড়িতে বড় অন্ধকার ক্ষ্যামা! আমি প্রদীপটা ধরি।"

ক্ষ্যামা বলিল, "আরে না, আমার বাড়ী,—আমি অন্ধকারেই যেতে পারব, আমার জন্য আর তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও।" এই বলিয়া ক্ষ্যামা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সুশীলা সদরদুয়ার খোলার শব্দ পাইল।

ক্ষ্যামা চলিয়া গেলে সুশীলা ঘরের মধ্যে গেল। দেখিল ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছুই নাই। একপাশে দুইটা মাদুর পাতা আছে। একটা মাদুরের উপর একটী বিছানা জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা মাটীর দেরকোর উপর একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহারই পার্শ্বে একটা মেটে-কলসীতে জল রহিয়াছে, এবং কলসীর পার্শ্বেই

একটা পিতলের ঘটী রহিয়াছে। ঘরের আর এককোণে কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য দুই দেওয়ালে পেরেক মারিয়া তাহার সঙ্গে দড়ি বাঁধা আছে। ঘরের একটীমাত্র দ্বার এবং পিছনের দিকে দুইটী জানালা, এবং সম্মুখদিকের ঘরের দুই পার্শ্বের দেওয়ালের গায়ে দুইটা কুলঙ্গী। সুশীলা শ্যামার নিকট শুনিয়াছিল যে, সে এ বাড়ীতে থাকে না, যাত্রীরা আসিলে ভাড়া দেয়; সুতরাং ঘরে আসবাব্‌পত্র না দেখিয়া তাহার মনে কোন সন্দেহেরই উদয় হইল না। সে কলসী হইতে ঘটীতে জল গড়াইয়া লইয়া ছাতের উপর হাতমুখ ধুইল এবং তাহার পর ঘরের মধ্যে যাইয়া মাদুরে বসিল।

[২৪]

এইবার ক্ষ্যামা এবং এই বাড়িটীর কথা বলিতে হই-তেছে। এই দুইটী কথা না বলিলে কথাটা যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, নতুবা একথাগুলি না বলিলেই ভাল হইত।

এই যে বাড়ীটা, ইহা ক্ষ্যামার নহে। ক্ষ্যামা যদি কাশীতে এমন একটা বাড়ীই করিতে পারিত, তাহা হইলে সে রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে রাধুঁনীগিরি করিত না। কাশীতে যার এমন একটা বাড়ী আছে, তাহাকে আর পরের বাড়ীতে চাকরী করিতে হয় না। বিশেষ ক্ষ্যামা অসচ্চরিত্রা ; সে যে একমুষ্টি অন্নের জন্য এখনই পরের বাড়ী ভাত রাঁধিবে, তাহা নহে।

এ বাড়ীটা ক্ষ্যামার নহে – বাড়ীর মালিক আর একটী স্ত্রীলোক। সেও ক্ষ্যামারই মত অসচ্চরিত্রা ; সে প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে ; ক্ষ্যামার মত রাঁধুনীগিরি করে না। এ বাড়ীখানি সেই স্ত্রীলোকটী যাহাকে-তাহাকে ভাড়া দেয় না ; এ বাড়ীতে সে যাত্রীও রাখে না। কিন্তু এ বাড়ী হইতে তাহার যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে।

কাশী পুণ্যভূমি, কাশী পরমপবিত্র স্থান। আবার কাশীর

মত অপবিত্র স্থানও বুঝি আমাদের দেশে আর নাই। বাবা বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয়-লাভের জন্য, অন্তিমে জাহ্নবীতীরে তনু-ত্যাগের জন্য অনেক ধর্ম্মপিপাসু নরনারী এখানে জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইতে আগমন করিয়া থাকেন। আবার দেশের যত পাপের বোঝা নামাইবার জন্য, ধর্ম্মের নামে বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্যও শত শত নারীনর এই পুণ্য-ভূমিতে আগমন করিয়া থাকে। কেহ বা ধর্ম্মের আবরণে, আর কেহ বা প্রকাশ্যভাবে এখানে বীভৎস কার্য্য করিয়া থাকে। কাশীতে যে প্রতিদিন কত কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা বলা দূরে থাকুক, মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাক্, সে সকল পাপের চিত্র আর দেখাইয়া কাজ নাই, তাহা গোপনেই থাকুক। বাবা বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি, এ সকল কলুষিত ব্যাপার যেন কাশীর বক্ষ হ'তে মুছিয়া যায়—কাশী যেন সত্যসত্যই স্বর্গে পরিণত হয়।

সুশীলা যে বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে, বাড়ীওয়ালী ঐ বাড়ীখানি যাত্রীদিগকে ভাড়া দেয় না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে কি বাড়ীখানি পড়িয়া থাকে? তাহা নহে। কাশীতে এই রকম অনেক বাড়ী আছে। সে সকল বাড়ী দিবাভাগে

চাবীবন্ধ থাকে ; কেহ দিনের বেলায় এ সকল বাড়ীতে থাকে না। রাত্রিতে এই সকল বাড়ীতে লোকসমাগম হয়। কাশীর বদ্‌মায়েসেরা এই সকল বাড়ী তাহাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাখিয়াছে। বাড়ীওয়ালীরা এই সকল বাড়ী রাত্রির জন্য ভাড়া দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

পাঠক পাঠিকাগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, সুশীলার বিপদে সাহায্য করিবার জন্যই, তাহার উদ্ধারের জন্যই ক্ষ্যামা এই কার্য্য করিয়াছে,—সুশীলার পলায়নের সাহায্য করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। ক্ষ্যামা সে প্রবৃত্তির স্ত্রীলোক নহে ;—সে মূর্ত্তিমতী পাপ—সে নারিদেহধারিণী সয়তানী ! সে সুশীলার উপর দয়া করিয়া, তাহার এই বিপদে সাহায্য করিতে যায় নাই। রমানাথ কিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশায় সুশীলাকে ভুলাইয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল ; ক্ষ্যামাও সেই আশাতেই সুশীলাকে রমানাথের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া এই বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলে, সুশীলা যখন জানালা হইতে তাহার সাহায্য-প্রার্থনা করিল, তখন সে মনে মনে ভারী খুসী হইল। সে মনে করিল, চক্র-

বর্ত্তীর গ্রাস হইতে সুশীলাকে রক্ষা করিয়া সে তাহাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিলক্ষণ দশটাকা লাভ করিবে। তাই সে সুশীলাকে সাহায্য করিতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়াছিল।

ক্ষ্যামা রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যখন সুশীলার সহিত পলায়নের কথা স্থির করিল, তখন সে সুশী-লাকে লইয়া কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার হাতে অনেক ধনী যুবক ছিল; সে এই সকল যুবকের অনেক কুকার্য্যের সহায়তা করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিত। সুশীলাকেও এই শ্রেণীর একটী যুবকের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিল। সে তখন বড়রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এটী একটী হিন্দুস্থানী বড়লোকের বাড়ী। যিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জনপূর্ব্বক এই বাড়ী এবং যথেষ্ট টাকাকড়ি ও কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন; এখন তাঁহার একমাত্র যুবক পুত্র বিপুল বিষয় হস্তে পাইয়া দুই হাতে অর্থ উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাশীতে সে সময়ে ঐ যুবকের 'বাবু' বলিয়া একটা নাম রটিয়াছিল; অনেক মোসাহেব তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল;—তাহারা

দিবানিশি যুবককে নানা কুকার্য্যে উৎসাহিত করিত। ক্ষ্যামা-জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের সহিতও এই যুবকের বিশেষ পরিচয় ছিল।

ক্ষ্যামা যখন তখনই এই বাড়ীতে যাইত। দ্বারবানেরা তাহাকে চিনিত এবং সে বাবুর প্রিয়পাত্রী জানিয়া তাহার গতিবিধির বাধা দিত না। ক্ষ্যামা এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া বরাবর উপরে চলিয়া গেল এবং উপরের প্রকাণ্ড বৈঠকখানার ভিতর উঁকি দিয়া দেখিল। বাবু তখন বৈঠকখানাতেই ছিল। ক্ষ্যামাকে দেখিয়াই বাবু ডাকিল, "ক্ষ্যামা যে! বলি, এই দুপুর-বেলায় কি মনে ক'রে? ঘরের ভিতরে এস।"

ক্ষ্যামা তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর বাবুর সহিত তাহার যে সমস্ত কথা হইল, যে সকল কুৎসিত রসিকতা হইল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখনী অপবিত্র করিতে পারিব না—আর সে সকল পাপ কথা বলিয়াই কাজ নাই—সে পাপের চিত্র আঁকিয়া কোন লাভ নাই। আসল কথা এই; ক্ষ্যামা সুশীলাকে সেই রাত্রিতেই বাবুর করতলগত করিয়া দিবে, ইহাই স্থির হইল। রাত্রি নয়টার পরে বাবু ক্ষ্যামার

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গমন করিবে এবং ক্ষ্যামা তাহার কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ সেই রাত্রিতেই নগদ কুড়িটি টাকা পাইবে; এবং সে যে ভবিষ্যতে আরও পাইবে, বাবু তাহাকে এ আশাও দিল।

এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া ক্ষ্যামা তাহার পরিচিত বাড়ীওয়ালীর নিকট গেল। ইতঃপূর্ব্বেও ক্ষ্যামা অনেকবার ঐ বাড়ীওয়ালীর নিকট হইতে এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছে; সুতরাং বাড়ীওয়ালীর সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। সে তখন বাড়ীওয়ালীর নিকট হইতে চাবী লইয়া ঐ বাড়ীতে গেল এবং একটা কলসী কিনিয়া জল তুলিয়া এবং ঘরখানি পরিষ্কার করিয়া রাখিল। বাড়ীতে যে মাদুর ও সামান্য বিছানা ও ঘটী ছিল, তাহা বাড়ী-ওয়ালীরই সম্পত্তি। এই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ক্ষ্যামা তাহার নিজের বাসায় চলিয়া গেল। তখন বেলা অধিক ছিল না; সুতরাং সে সময়ে আর রান্নার আয়োজন সে করিল না; বাজার হইলে জলখাবার কিনিয়া আনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তাহার পর সে লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। তাহার পর সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সে আপনার শিকার হস্তগত করিতে বাহির হইল।

কাশীতে এ প্রকার ঘটনা নূতন নহে, বলিতে গেলে এ রকম ব্যাপার প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাঁহারা কাশীর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহার অপেক্ষাও ভীষণ, বীভৎস অনুষ্ঠানের কথা বলিতে পারেন। বাবা বিশ্বেশ্বরের পুণ্যভূমিতে, তাঁহারই শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ নাম লইয়া, প্রতিদিন কত জন এই সকল কুৎসিত কার্য্য করিতেছে, কত জন এই সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। হায় বাবা বিশ্বেশ্বর, তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য কি তুমি তোমার রুদ্র-বাহু প্রসারিত করিবে না? তোমার সোণার কাশীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তুমি কি একবার হুঙ্কার দিয়া উঠিবে না? কাশীর পবিত্র বক্ষ হইতে কি এ সকল কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যাইবে না? এই সকল নরকের কথা আর কতদিন শুনিতে হইবে? লেখকের পরম দুর্ভাগ্য! কোথায় সে তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করিবে, না তাহাকে সেই তীর্থস্থানের কলঙ্কের ছবি দেখাইতে হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই; আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিতেছে না; আমাদের তীর্থস্থানগুলির কলঙ্কের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে যে, তাহাদের দিকে ধর্ম্মপ্রাণ মহাশয়দিগের দৃষ্টি

নিপতিত হয় না। তাই বাধ্য হইয়া এই নরকের চিত্র সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইল।

এখন ক্ষ্যামার কথা বলি। তাহার সেই বাবুর আদেশ ছিল যে, সে ঐ বাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য এবং পাপকার্য্যের আনুসঙ্গিক দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। তাহার নিজের ক্ষুধাবোধ হয় নাই; আর হইলেও সে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া জলখাবার কিনিয়া খাইত না। বাবু তাহার হাতে সমস্ত আয়োজন করিবার জন্য টাকা দিয়াছিল; তাই সে বাজারে বাহির হইয়াছিল।

যদি শুধু জলখাবার কিনিয়া আনিতে হইত, তাহা হইলে ক্ষ্যামার বিলম্ব হইত না, কারণ গলির মোড়েই খাবারের দোকান ছিল। কিন্তু তাহার উপর অন্য জিনিস কিনিবারও ফরমাইস ছিল; সে সকল জিনিষ মিষ্টান্নের দোকানে পাওয়া যায় না; তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে 'সরকারের সনন্দপ্রাপ্ত' দোকানে যাইতে হয়; এবং সে দোকান গলির মোড়েই ছিল না; সুতরাং ক্ষ্যামাকে একটু দূরে যাইতে হইল।

নীচের সদর-দ্বার খোলা রহিয়াছে; নূতন স্থান; বাড়ীতে জনমানবের সম্পর্ক নাই;—সুশীলার ভয় হইতে লাগিল।

ক্ষ্যামা বলিয়া গিয়াছিল যে, সে তখনই ফিরিয়া আসিবে ; অথচ প্রায় পনর মিনিট চলিয়া গেল, তাহার দেখা নাই। সুশীলার ভয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল এবং আস্তে আস্তে সদর-দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিতে গেল। কিন্তু ক্ষ্যামা ত কচিখুকী নহে—সে বাহিরদিকের তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছিল। সুশীলার তখন বড়ই ভয় হইল। একবার তাহার মনে হইল, পাছে কেহ দ্বার খোলা দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, এই জন্যই হয় ত ক্ষ্যামা দ্বারে তালা লাগাইয়া গিয়াছে। আবার মনে হইল, হয় ত তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে! সুশীলা তাহার বিলম্ব দেখিয়া হয় ত মনে সন্দেহ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে বা পলায়ন করিতে পারে, তাই হয় ত সে তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছে। রুদ্ধদ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুশীলা এই রকম কত চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, সুশীলার ততই ভয় বাড়িতে লাগিল। সে তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ; তাহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না। একবার মনে হইল,

সে চীৎকার করে ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ক্ষ্যামার মনে যদি কোন দুরভিসন্ধি না থাকে, সে যদি সত্যসত্যই তাহার মঙ্গলকামনাকারিণী হয়, তাহা হইলে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে সে আশ্রয়শূন্য হইবে। তখন সে এই রাত্রিতে, এই অপরিচিত স্থানে, কোথায় কাহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইবে।

এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিতেছে, এমন সময় দুয়ারের তালা-খোলার শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। তখন সে তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। ক্ষ্যামা সহসাই বাড়ীর মধ্যে আসিতে পারিল না, কারণ তাহার দুই হাতই যোড়া ছিল। হাতের দ্রব্যাদি নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে দ্বার খুলিতে হইয়াছিল। দ্বার খুলিয়া সেই সকল দ্রব্য ভিতরে আনিতে যে সময় লাগিল, সেই অবকাশে অন্ধকারের মধ্যে সুশীলা উপরে চলিয়া গেল, ক্ষ্যামা বুঝিতেও পারিল না যে, সুশীলা দ্বারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল।

ক্ষ্যামা এ দিকে যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই নীচের অন্ধকার ঘরে তখনকার মত রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ সে সকল গেলাস বোতল ইত্যাদি উপরে লইয়া গেলে সুশীলা তখনই একটা গোল বাধাইয়া

বসিবে, এ কথা সে বুঝিয়াছিল। অন্ধকারের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য নীচের ঘরে রাখিয়া সে শুধু জলখাবারের ঠোঙ্গাটা হাতে করিয়া উপরে গেল।

সুশীলা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার এত বিলম্ব হ'ল কেন?"

মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে শ্যামা অভ্যস্ত ছিল; সে অমনি বলিয়া বসিল "আর সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না ভাই! আমারও যেমন গেরো। বাড়ী থেকে যখন বেরুই, তখন একটা টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। টাকাটা যদি বাজিয়ে আনি, তা হ'লে আর কোন গোল হয় না? আমি জানতাম, আমার বাক্সে যে কয়টা টাকা আছে, তার সবগুলোই ভাল; আমার মত গরীব মেয়েমানুষকে ঠকাবার জন্যে যে কেউ ভাঙ্গা মেকি টাকা দিয়েছে, তা কি আর আমি জানি। দোকানে গিয়ে, খাবার কিনে নিয়ে দোকানীকে সেই টাকাটা দিলাম। আরে আমার অদৃষ্ট! দোকানী টাকাটা বাজিয়ে দেখেই ফিরিয়ে দিল; বল্‌ল 'ওগো, এ টাকাটা চল্‌বে না, এটা মেকি।' আমি টাকাটা মেজের উপর বাজিয়ে দেখি—বাজে না। সত্যিই ত মেকি! তখন দোকানীকে বল্‌লাম 'আমার কাছে ত আর

পয়সা নেই, তোমার খাবার ফিরিয়ে নেও।' সে ফিরিয়ে নিতে চায় না। আবাগের বেটা বলে কি 'তুমি মুচি কি মুসলমান, কি জাত, তোমার ছোঁয়া খাবার ফিরিয়ে নেব না।' আমি বললুম, ওগো আমি বামুনের মেয়ে! সে কি সে কথা শুনতে চায়। অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে তবে তাকে খাবার ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম, খাবারটা আলাদা রাখ, আমি বাড়ী থেকে পয়সা এনে দিয়ে খাবারটা নিয়ে যাব। তখন আর কি করি? তোমার কাছে ত কিছু নেই যে, দৌড়ে এসে চেয়ে নিয়ে যাব। আবার এই রাত্তিরে বাড়ী ছুটলুম। সেখানে যাই, ঘর খুলি, বাক্স খুলি, টাকা বা'র করে বাজিয়ে দেখে নিয়ে আসি; তার পর এই খাবার নিযে ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি, আর ভাব্‌ছি তুমি এই অজানা জায়গায় এতক্ষণ একলা ব'সে থেকে কি-ই না জানি ভাব্‌ছ। ভয় টয় ত পাও নি! তবুও ভাগ্যি যে, দুয়োরটায় বাইরের দিক থেকে তালা-বন্ধ করে গিয়েছিলাম; নইলে কাশী যায়গা, দুয়োর খোলা দেখে কেউ যদি ঢুকে পড়ত, তা হ'লে ত তুমি চেঁচিয়েই মর্‌তে।

সুশীলা আশ্বস্ত হইয়া বলিল "আহা, ক্ষ্যামা তুমি আমার জন্য কত কষ্ট করছো। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার

কেউ ছিলে, তাই আমার এই বিপদের সময় তোমাকে পেয়েছি।”

ক্ষ্যামা সুশীলার কথায় বাধা দিয়া বলিল, ‘যাক্, সে কথায় আর কাজ নেই, রাত হ’য়ে যাচ্ছে; তুমি একটু জল খাও, আমি কিছু মুখে দিই।”

সুশীলা বলিল “ক্ষ্যামা আমি আর এত রাত্তিরে কিছুই খাব না। ঘটীতে গঙ্গাজল আছে, তাই একটু খাব। আজ আর কিছু না—কাল বাবা বিশ্বেশ্বর যা দেন, তাই হবে।”

ক্ষ্যামা বলিল, “তা কি হয়! এই দেখ ত, আমি এত কষ্ট ক’রে খাবার নিয়ে এলাম, আর তুমি——” এমন সময় নীচের তলায় কড়া নাড়িবার শব্দ হইল।

ক্ষ্যামা বলিল “তাই ত, এত রাত্তিরে এ বাড়ীর কড়া নাড়ে কে? যাই ত, একবার দেখে আসি।”

সুশীলা ভীতস্বরে বলিল, “না ক্ষ্যামা, তুমি যেও না; আমার ভয় হচ্ছে; হয় ত ঠাকুরই বা খোজ নিতে নিতে এখানে এসেছে। তুমি যেও না ক্ষ্যামা! কড়া নেড়ে নেড়ে যখন সাড়া পাবে না, তখন যেই হয় ফিরে যাবে।”

ক্ষ্যামা বলিল, “তুমি ত কাশীর খবর জান না। হয় ত

পুলিশের লোক এসেছে। এ বাড়ী ত বন্ধই থাকে ; পাহারা-ওয়ালারা রাত্তিরে তা দেখ্‌তে পায়। আজ দোরে তালা লাগান নেই দেখে, খবর নিতে এসেছে। এখন কাশীতে যাত্রী এলে তাদের সব খবর পুলিশের লোকেরা লিখে নিয়ে যায়। তারাই এসেছে।"

সুশীলা আরও ভীতা হইল ; সে বলিল "তা হ'লে কি হবে ক্ষ্যামা! তুমি কি ব'লে আমার পরিচয় দেবে?"

ক্ষ্যামা বলিল, "তার জন্য তুমি ভাব্‌ছ কেন। সে আমি বলে দিচ্ছি। কেন, আমি বল্‌ব কল্‌কাতা থেকে আমার বোনঝি এসেছে।"

সুশীলা বলিল, "তারা যদি কলকাতার ঠিকানা জান্‌তে চায়?"

ক্ষ্যামা বলিল, "তা হলেই বা কি? আমি বল্‌ব, কল্‌কাতার তালতলায় ১১ নম্বরের বাড়ীতে আমার বোন থাকে। তুমি ভয় করছ কেন, চুপ ক'রে বসে থাক, লোকজন এলেও কোন কথা বোলো না—যা বল্‌বার হয় আমিই ব'ল্‌ব। কোন ভয় নেই।" এই বলিয়া ক্ষ্যামা প্রদীপ লইয়া নীচে নামিয়া গেল ; সুশীলা অন্ধকারে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

কড়া যে কে নাড়িয়াছিল, ক্ষ্যামা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল; পাঠকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন। ক্ষ্যামা নীচে যাইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। একটী বাবু এবং একজন মোসাহেব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, সব ঠিক ?"

ক্ষ্যামা বলিল, "ঠিক নয় ত কি? আমার কথা কি কখন নড়চড় হইতে দেখিয়াছেন! এখন উপরে আসুন।" ক্ষ্যামা আর যাহা বলিল, তাহা আর লিখিতে পারিতেছি না।

ইহার পর যে অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহারও কি যথাযথ বিবরণ দিতে হইবে? তাহা আমি পারিব না! সে নারকীয় কথা,—সে দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারিব না—দিব না। 'বাস্তবতার' নামে যিনি যাহা ইচ্ছা বলুন, আমি বুড়া-বয়সে এমন কার্য্য করিতে পারিব না। পাষণ্ড, নরপিশাচের কথাবার্ত্তা, তাহার আচরণ, 'বাস্তবতার' নামে আমি দেখাইতে পারিব না;—অসহায়া রমণীর কাতরদৃষ্টি, তাহার অনুনয় বিনয়, তাহার সতীত্ব রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা—ইহার দৃশ্য আমি দেখাইতে পারিব না। পাপীয়সী ক্ষ্যামার কথা আমি আর বলিতে পারিব না—তাহার নাম উল্লেখ করিয়াও এ পুস্তকের পৃষ্ঠা আমি আর

কলঙ্কিত করিব না। হতভাগিনী সুশীলা যে কেমন করিয়া এই নরপিশাচদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল, তাহার সতীত্বরত্ন যে কেমন করিয়া রক্ষা পাইল, তাহাই আমি অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ পাপ-দৃশ্যের উপর যবনিকা ফেলিয়া দিব।

[২৫]

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। পুলিসের দারোগা রামপ্রতাপ চৌবে একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন। পুলিসের যিনি যত নিন্দাই করুন, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, পুলিসের সকল লোকই খারাপ—পুলিশে ভাল লোক, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক নাই। তাহার প্রমাণ এই দারোগা রামপ্রতাপ চৌবে। সম্ভ্রান্ত-বংশের ছেলে, ভাল লেখাপড়া জানেন, সচ্চরিত্র, সাধু-প্রকৃতি এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ এই চৌবে দারোগার নাম তখন কাশীর সকলেই জানিত, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

কে যেন দারোগা চৌবেকে সেই রাত্রিতে এই গলির মধ্যে লইয়া আসিল। এ সময়ে তিনি গলির মধ্যে প্রায়ই আসেন না; সদর রাস্তাতেই যাতায়াত করেন। আজ তাঁহার খেয়াল হইল; তাই তিনি কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া এই অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা অদৃষ্টবাদী হিন্দু, আমরা অদৃষ্ট মানি, আমরা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা মানি। যে বিপদভঞ্জন মধুসূদন সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ

করিয়াছিলেন, সতীর সতীত্বরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আজ দারোগা চৌবেকে এই অন্ধকার গলির মধ্যে এত রাত্রিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা সেই বিশ্বনাথেরই খেলা!

দারোগা চৌবে মহাশয় যখন এই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন রমণীকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল "বাবা বিশ্বনাথ, আমাকে রক্ষা কর—আমাকে বাঁচাও।" এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র দারোগা এক লম্ফে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "কোন্ হ্যায়, কেয়ারি খোল দেও।"

সহসা বজ্রপাত হইলে মনে যেমন আতঙ্কের সঞ্চার হয়, এই চীৎকার শুনিয়া বাবু, তাহার সঙ্গী এবং শ্যামা তেমনই হইয়া পড়িল। তাহারা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। বাবু সুশীলার বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছিল—তৎক্ষণাৎ বস্ত্র ছাড়িয়া দিল; সুশীলা সেই অবস্থায়ই দৌড়াইয়া ছাতের উপর গেল।

আবার শব্দ হইল "জল্‌দি কেয়ারি খোল দেও।"—কোন উত্তর নাই। তখন দারোগা কনষ্টেবলকে দ্বার ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। পুরাতন বাড়ীর পুরাতন দ্বার—কনষ্টেবলের দুই

তিনটা পদাঘাতেই খুলিয়া গেল। তখন দারোগা মহাশয় ও কনষ্টেবল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে ঘোর অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না; কোন্ দিকে পথ, কোন্ দিকে সিঁড়ি, তাহা তাঁহারা মোটেই জানেন না। দারোগা মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন "কোন্ হ্যায়, জল্‌দি বাতি দেখ্‌লাও।" কিন্তু কেহই কোন উত্তর করিল না। সুশীলা কথা শুনিল বটে, কিন্তু তাহার তখন এমন শক্তি ছিল না যে, কথা বলে।

একটু অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, কেহ সাড়া দিল না, বা বাতি লইয়া আসিল না; তখন দারোগা মহাশয় পকেট হইতে দিয়াসলাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন। সেই আলোকে তাঁহারা উপরে যাইবার সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। তখন দারোগা মহাশয় পকেট হইতে গুলিভরা একটা রিভলভার বাহির করিয়া কনেষ্টবলকে বলিলেন "তুমি এই দুয়ারের কাছে দাঁড়াও, আমি উপরে যাইতেছি। যদি কেহ বাহির হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে গুলি চালাইবে। খবরদার, কেহ যেন বাহিরে যাইতে না পারে।" এই বলিয়া তিনি আর একটি দিয়াসলাই ধরাইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে

লাগিলেন। অৰ্দ্ধেক পথেই দিয়াসলাইটা নিবিয়া গেল। যদিও তিনি সিঁড়ি দিয়া তখন উপরে যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার একটু ভয় হইল। উপরে যাহারা আছে, তাহারা যদি সংখ্যায় বেশী হয় এবং অতর্কিতভাবে এই অন্ধকারে তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়াইয়াই বলিলেন "শোন, উপরে যেই থাক; যদি বাধা দিতে এস, তাহ'লে আমি এখনই গুলি কর্‌ব। যদি ভাল চাও, এখনই আলো লইয়া বাহির হও।" এই বলিয়া তিনি রিভল্‌ভারটা উচু করিয়া ধরিয়া আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিলেন। সেখান হইতেই দেখিতে পাইলেন, উপরের ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলিতেছে। আলো দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল; তিনি আরও দুই একটা সিঁড়ি উঠিতেই ঘরের আলোটা নিবিয়া গেল। দারোগা মহাশয় তখন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া বলিলেন "রামাবতার, উপার আও।"

এই আদেশ পাইয়া কনষ্টেবল রামাবতার উপরে উঠিয়া আসিল। তখন দারোগা মহাশয় তাহার হস্তে দিয়াসলাইয়ের বাক্স দিয়া বলিলেন "আলো জ্বাল।" রামাবতার দিয়াসলাই

১৭৭]

জ্বালিতেই উপরের ছাত হইতে সুশীলা চীৎকার করিয়া বলিল "বাবু, আমাকে রক্ষা কর।"

তখন দারোগা মহাশয় এক দৌড়ে উপরে উঠিয়া গেলেন, কনষ্টেবল সিঁড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া আর একটা দিয়াসলাই জ্বালিল। সুশীলা তখন দারোগা মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার পা-জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া "বাবু, আমার প্রাণ বাঁচাও!"

দারোগা মহাশয় বলিলেন "তোমার কোন ভয় নেই; কি হইয়াছে বল।" সুশীলা বলিল "ওরা আমার উপর অত্যাচার করতে এসেছে।"

"ওরা কে? তারা কোথায়?"

সুশীলা বলিল "তারা ঘরের মধ্যে আছে।"

এই কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই অন্ধকার-ঘরের দ্বারের পার্শ্বে গেলেন; ঠিক দ্বারের সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না; কি জানি ঘরের মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের হাতে যদি বন্দুক কি পিস্তল থাকে; তাহা হইলে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য গুলিও করিতে পারে। তিনি দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন "শীঘ্র আলো

জ্বাল! বিলম্ব করিলে আমি ঘরের মধ্যে গুলি করিব।'

এই কথা শুনিয়া শ্যামা কাঁদিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া দারোগা মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "দোহাই সাহেবের, আমি কোন অপরাধ করি নাই—আমার কোন দোষ নেই।"

দারোগা মহাশয় পা-ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন "চুপ্ রহ! জল্‌দি বাতি জ্বালাও।"

"এই আমি বাতি জ্বালছি" বলিয়া শ্যামা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া প্রদীপ জ্বালিল। তখন দারোগা মহাশয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরের এককোণে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দুইটী বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দারোগা মহাশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "কে তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে? শীঘ্র ফিরে দাঁড়াও, নইলে আমি এখনই গুলি করব।"

এই কথা শুনিয়া বাবুদুইটী মুখ ফিরাইয়া নতমস্তকে দাঁড়াইল; তাহাদের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। বাবুটীকে দেখিয়াই দারোগা মহাশয় বলিলেন "বাঃ, অর্জ্জুনলাল

বাবু, তুমি এই কাজ করতে এসেছ? ওটী বুঝি তোমার মোসাহেব।"

অর্জ্জুনলাল আর কথা বলিতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। দারোগা মহাশয় তখন ক্ষ্যামার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোকে যেন কোথায় দেখেছি। তুই কোথায় থাকিস্, ঠিক করে বল?"

ক্ষ্যামা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "দোহাই সাহেবের, ঐ বাবুরাই আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল; আমি এ সকলের কিছুই জানিনে।"

"তুই কোথায় থাকিস্, সত্যি বল্?"

"আমি রমানাথ ঠাকুরের বাড়ীর রাঁধুনী।"

"তাই বল্! এই ব্যাপারের মধ্যে তা হ'লে রমানাথ ঠাকুরও আছে। এই বাঙ্গালী মেয়েটি কে?"

ক্ষ্যামা বলিল "তা আমি জানিনে; বাবুরা ওকে এখানে এনে রেখেছে, আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি কি অতশত জানি; তাই আমি বাবুদের সঙ্গে এসেছিলাম।"

দারোগা বলিলেন "তোর সব কথা মিথ্যে; তুই-ই এ কাজ করেছিস্। খবরদার, কেউ এক-পা নড়ো না; যে যেখানে

আছ, ঠিক দাঁড়িয়ে থাক। আমি মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করি।” এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সুশীলা ছাতের একপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল। দারোগা মহাশয় তাহাকে বলিলেন “:তামার কোন ভয় নেই। আমি পুলিশের দারোগা। তুমি বল দেখি, ব্যাপার কি হয়েছে।”

সুশীলা তখন কাশী-ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছিল, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিল; তাহার সঙ্গে কেহ নাই, তাহার সঙ্গে একটী পয়সাও নেই; তাহার পর সে অতি কাতরবচনে বলিল “আপনারা না এলে আমার যে কি হোতো, তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন। আমার পাপের শেষ নাই, তাই আমার শাস্তিও হচ্চে। আপনি আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন।” সুশীলা আর কথা বলিতে পারিল না। ভদ্রগৃহস্থের মেয়ে অপরিচিত পুরুষ-মানুষের সম্মুখে আজ যে এত কথা বলিতে পারিয়াছে, সে সুধু উপায়ান্তর না দেখিয়া; কিন্তু কথাগুলি যেমন করিয়া গোছাইয়া বলা উচিত ছিল, তাহা সে পারিল না, তাহার পক্ষে তেমন করিয়া কথা বলা অসম্ভব।

দারোগা বাবু এই সকল কথা শুনিয়া অর্জ্জুনলালের দিকে

ফিরিয়া বলিলেন "দেখ, অর্জ্জুনলাল বাবু, তুমি যে বদ্‌মায়েস, তা আমি জান্‌তাম; কিন্তু তুমি যে এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ, তা আমি আজ জান্‌লাম। তোমাকে যদি আমি আজ চালান দিই, তাহ'লে তোমার খুব সাজা হবে, তুমি একেবারে জন্মের মত যাবে। কিন্তু আমি তা করব না, তোমার উপর দয়া করে যে এ কথা বল্‌ছি, তা নয়; আমি এই ভদ্রলোকের মেয়েটিকে কাছারীতে, কি থানায় দাঁড় করাতে চাইনে। মেয়েটি ভাল, তা তার কথা শুনেই মনে হচ্চে। দেখ অর্জ্জুনলাল, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও এমন কাজ কোরো না। আমি তোমার উপর চোক রাখব; তুমি কি কর, না কর, তা দেখ্‌বার জন্য আমি আজ থেকে গোয়েন্দা মকূরর করব। এর পরে কোনদিন যদি তোমার কোন বদ্‌মাইসী দেখি, তা হলে মনে রেখো, তোমাকে পাঁচ বছর জেল খাটবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। তুমি যাও; খবরদার! আর কখনও এমন কাজ করো না।" তাহার পর কনষ্টেবলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবু দুটীকে যেতে দেও।"

বাবু দুইটী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষ্যামাও তাহাদের সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল; দারোগা বাবু বাধা দিয়া বলিলেন

"তুই কোথায় যাচ্ছিস্? তোকে আমি অল্পে ছাড়্‌ব না। চল্, রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাই। সেখানে গিয়ে তোর যা ব্যবস্থা হয়, তাই করব।" তাহার পর সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা, তোমার আর কোন ভয় নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে এস; রমানাথের বাড়ীতে যাই।"

সুশীলা ভীতস্বরে বলিল "আমার সেখানে যেতে ভয় করে।"

দারোগা বলিলেন "ভয় কি মা! আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি কিছু ভয় কোরো না, এস।"

তখন তাঁহার আদেশে কনষ্টেবল ক্ষ্যামার হাত চাপিয়া ধরিয়া নীচে নামাইয়া লইয়া গেল; তাহার পর সুশীলা এবং দারোগা নামিয়া রাস্তায় আসিলেন। দারোগা সুশীলাকে বলিলেন "মা, এই একটু পথ কি তুমি হেঁটে যেতে পারবে না? নইলে একখানি গাড়ী ডাকতে হয়; তাহলে বড় দেরী হয়ে যাবে।"

সুশীলা বলিল "আমি বেশ যেতে পারব।" সুশীলার কিন্তু তখন আর চলিবার শক্তি ছিল না; দুই দিন অনাহার অনিদ্রা, তাহার উপর এই বিপদ,—তাহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিল। তবুও সে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিল "আমি বেশ যেতে পারব।"

নানা গলি অতিক্রম করিয়া তাহারা রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কনষ্টেবলের ডাকাডাকিতে বাড়ীর লোকেরা উঠিয়া পড়িল; স্বয়ং রমানাথ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দারোগা বাবু, আর তাঁহার সঙ্গে শ্যামা ও সুশীলাকে দেখিয়াই রমানাথের চক্ষুস্থির হইয়া গেল! সে দারোগা বাবুকে সেলাম করিয়া বলিল "হুজুর, এত রাত্রিতে আমার তলব কেন?"

দারোগা বাবু বলিলেন "তোমার বাড়ীতে এই মেয়েটি ছিল?"

রমানাথ বলিল "হাঁ হুজুর, এই মেয়েটি একলা ষ্টেসনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; আমি গরিব মনে করে এখানে এনেছিলাম। হুজুর, মেয়েটা ভারি বজ্জাত। বাবার দর্শনে যাচ্ছি ব'লে এখান থেকে বেরিয়ে ওদের দলের লোকের সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল।"

দারোগা বাবু বলিলেন "সে সব আমি জানি। এটী তোমার বাড়ীর রাঁধুনী, কেমন? তোমার তেতালার ঘরে যে

বাবুটি আছে, তাকে ডাক। আমি সব জান্‌তে পেরেছি; আজ তোমাকে, তোমার এই বামণীকে, আর তোমার সেই বাবুটীকে আমি ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে যাব।”

রমানাথ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল “দোহাই ধর্ম্মাবতার,— আমি এর কিছুই জানিনে; আমার কোন অপরাধ নেই;— আমি গরীব ব্রাহ্মণ—বাবার নাম ক'রে—”

“চুপ রহ—তোমার বাবার নাম আমি বা'র ক'রে দিচ্ছি। তোমার সেই বাবুকে ডাক? জল্‌দি যাও।”

রমানাথ কি করিবে; সে বাবুকে ডাকিতে গেল। যোগেশ তখন তেতালার ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। রমানাথ সেখানে গিয়া তাহার দ্বারে ধাক্কা দিয়া বলিল “ওগো বাবু, শিগ্‌গির ওঠ। আচ্ছা বিপদে ফেলেছ, তুমি; শীগ্‌গির নেমে এস, তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশের দারোগা এসেছে। দেরী—”

তার কথা শেষ না হইতেই যোগেশ তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বলিল “কি, কি হয়েছে? এত রাত্রিতে এত ডাকাডাকি কেন?”

রমানাথ রাগিয়া বলিল “আচ্ছা লোক তুমি! কোথাকার

কার মেয়ে বা'র করে এনে এখন নিজেও মর, আমারও দফাটা শেষ কর! চল, আর ন্যাকা সেজে দাঁড়িয়ে থাক্তে হবে না—শীগ্গির চল।"

যোগেশ বলিল "কোথায় যাব? কেন? আমি চোরও নই, ডাকাতও নই। আমি কি পুলিশকে ডরাই; ঢের ঢের পুলিশ দেখেছি।"

রমানাথ রাগিয়া বলিল "ঢের দেখ্তে পার, কিন্তু রামপ্রতাপ চৌবের মত দারোগার হাতে কখন পড়নি। এখন চল; তোমার সুশীলাও দারোগার সঙ্গে এসেছে।"

"সুশীলা—সুশীলা দারোগার সঙ্গে এসেছে! তবেই ত গোল। ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি; তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমিই আমার মা বাপ! আমাকে বাঁচাও। তুমি যা চাবে, তাই দেব।"

রমানাথ বলিল "আরে বাপু; নিজে বাঁচলে ত তোমাকে বাঁচাব। তুমি ত এ দারোগাকে জান না। এ বড় শক্ত লোক; এ পুলিশের লোকের মত নয় যে, কিছু দিলেই সব মিটে যাবে। চোবে দারোগা যেমন তেমন লোক নয়। তার হাতে যখন পড়েছি, তখন ভারি বিপদ। এখন এস,

দারোগার হাতে-পায়ে জড়িয়ে ধ'রে যদি কিছু করতে পারা যায়, চল, তারই চেষ্টা করি গে, এখানে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর কাঁদলে কি হবে। চল!"

যোগেশ সন্ধিপূজার পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিতে লাগিল; তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। কলিকাতায় হইলেও না হয় দশজন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সে পাইত; কিন্তু এই কাশীতে তাহাকে কেহ জানেও না; কেহ চেনেও না; এখানে তাহার হইয়া দুটা কথা কে বলিবে? এক রমানাথ চক্রবর্ত্তী—কিন্তু তার অদৃষ্টেই কি হয়, বলা যায় না। এই প্রকার সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে যোগেশ রমানাথের সহিত নীচে নামিয়া আসিল।

তাহাকে দেখিয়াই দারোগা বলিলেন—"তুমিই বুঝি সেই বাবু। তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়? তুমি কি কর?"

দারোগা বাবুর প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব দেখিয়াই যোগেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এ লোকের নিকট হইতে সহজে অব্যাহতি-লাভের

সম্ভাবনা নাই। যোগেশ তখন অতি কাতরস্বরে নিজের পরিচয় দিল ; কিছুই গোপন করিল না।

তাহার পর দারোগা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন কর্ম্ম কেন করিলে ? এই ভদ্রলোকের মেয়েকে তুমি কেন এখানে নিয়ে এসেছ ?"

যোগেশ বলিল "আমি নিয়ে আসিনি, ও নিজে আমার সঙ্গে এসেছে। সত্য কি মিথ্যা, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

দারোগা বাবু তখন সুশীলাকে সমস্ত কথা বলিতে বলিলেন। সুশীলা কোন কথা গোপন না করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিল। তাহার পর বলিল "আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে আরম্ভ করেছি। আপনি যদি আমাকে উদ্ধার না করতেন, তাহা হ'লে আজই আমার সব শেষ হ'য়ে যেত।"

দারোগা বাবু সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "তা যা হ'বার, তা হয়ে গিয়েছে। তোমার একদিনের ভুলে তুমি যা করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত যে কি, তা বল্‌তে পারি না।" তাহার পর যোগেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে, তোমার সাহায্যকারী রমানাথকে, আর এইমাগীটাকে এখনই

চালান দিয়ে যেতে পারি ; এবং তোমাদের চালান দিলে গুরুতর শাস্তিও হবে। কিন্তু তাতে এই মেয়েটির আর উপায় থাকবে না; ওকেও ত থানায়, আদালতে যেতে হবে, সাক্ষ্য দিতে হবে। ওকে আর আমি সে শাস্তি দিতে চাইনে। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে কনষ্টেবল দিচ্ছি ; সে তোমাকে ষ্টেসনে নিয়ে গিয়ে আজকার রাত্রির গাড়ীতেই কলকাতায় চালান দিয়ে আসবে। এই মেয়েটির জন্যই তুমি এত সহজে অব্যাহতি পেলে। আর কখন এমন কাজ করো না। ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, তোমার এমন প্রবৃত্তি! আর তুমি রমানাথ চক্রবর্ত্তী, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনেছি ; কিন্তু এতদিন তোমাকে কোন কথা বলি নাই। তোমাকে বলছি, তুমি যদি এই মাগীকে সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের মধ্যে কাশী ছেড়ে না যাও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে না। আমি তোমাদের দুজনকে তাহলে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করব যে, তোমরা আর চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে না। আমার কথা বুঝেছ? তিন-দিনের মধ্যে তোমাদের এই কাশী থেকে চ'লে যেতে হবে। তিনদিনের পরও যদি তোমাদের এখানে দেখতে পাই, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।" এই বলিয়া তিনি কনষ্টেবলকে

যোগেশের সঙ্গে তখনই ষ্টেসনে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

তাহার পর সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি এখন কি করবে? তুমি যদি কল্‌কাতায় যেতে চাও, আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি। কিন্তু তোমার মা এখনও কল্‌কাতায় আছেন কি? আর তুমি যদি সাজাহানপুরে তোমাদের সেই বন্ধু বাবুটীর ওখানে যেতে চাও, তাহলে আমি তারও বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। এখন বল, তোমার কি ইচ্ছা?"

সুশীলা এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; সে যে কি বলিবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাঁইল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা বাবু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "ক্রমেই রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। তোমার কি অভিপ্রায় বলিয়া ফেল।"

সুশীলা তখন কাতরস্বরে বলিল "আমি কল্‌কাতায় কার কাছে যাব। মা হয় ত সেখানে নেই; আর থাক্‌লেও তিনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, আমাকে ঘরে নেবেন না। আমি

কোন্ মুখেই বা সতীশ বাবুর কাছে যাবো। আমার যে আর কোথাও স্থান নেই।" সুশীলা আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

দারোগা বাবু সুশীলার কথা বেশ বুঝিতে পারিলেন। এই যুবতী যে সকল কূল হারাইয়া বসিয়াছে, সংসারে যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু, উপায় কি? এই যুবতী বিধবা এখন কোথায়, কার আশ্রয়ে যায়? হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, কাশীতে তাঁহার একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী-বন্ধু আছেন। তিনি সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে আসিয়াছেন। এই রাত্রিতে মেয়েটিকে তাঁহাদের বাসায় রাখিয়া পরে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা—তিনি করিয়া দিবেন। এই মনে করিয়া তিনি সুশীলাকে বলিলেন "দেখ, যা বুঝছি, তাতে তোমার ত যাওয়ার স্থান নেই। আমি একেলা মানুষ; আমার পরিবার নেই যে, তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাই। বিশেষ আমি হিন্দুস্থানী, তুমি বাঙ্গালী! আমার একটি বাঙ্গালী-বন্ধু আছেন; তিনি বড় ভাল লোক। আজ তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাই। তার পরে যা হয়, করা যাবে। কি বল?"

সুশীলা বলিল "আপনি আমার বাপ; আমাকে আপনি আজ রক্ষা করেছেন; আপনি আমার জন্য যা কর্‌বেন, তাই হবে। আমার আর কে আছে?"

দারোগা মহাশয় তখন একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন এবং সুশীলাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া নিজেও সেই গাড়ীতে সওয়ার হইয়া বসিলেন। যাওয়ার সময় তিনি কন্‌ষ্টেবলকে যোগেশের সঙ্গে ষ্টেসনে যাইবার কথা পুনরায় বলিলেন এবং রমানাথ ও শ্যামাকে তিনদিনের মধ্যে কাশী ছাড়িয়া যাইবার কথা দ্বিতীয়বার বলিয়া গেলেন।

[২৬]

সুশীলা, দারোগা বাবুর কৃপায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মণের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। তিনি বহুদিন মুন্সেফী করিয়া এখন বৃদ্ধ-বয়সে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছেন। মুন্সেফ মহাশয়দিগের একটা বদ্নাম আছে যে, তাঁহারা সাধারণতঃ কৃপণ হইয়া থাকেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও যে পূর্ব্বে কৃপণ ছিলেন না, তাহা নহে; কিন্তু এখন আর তাঁহার সে কৃপণতা নাই; এখন তিনি যথেষ্ট ব্যয় করিয়া থাকেন। কৃপণতা করিয়া যে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পুত্রদিগকে ভোগ করিবার অবসর প্রদান করিয়া তিনি এখন কাশীতে আসিয়াছেন। মাসিক পৌনে-দুইশত টাকা পেন্সন্ পান। কাশীতে তিনি মাসে প্রায় এক শত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পক্ষে ইহা যে যথেষ্ট, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাড়ীতে দাসদাসী আছে, রন্ধন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আছে; মুখোপাধ্যায় মহাশয় গরীব দুঃখীকেও দু'পয়সা দান করিয়া থাকেন। সুশীলাকে আশ্রয় দান করিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কুণ্ঠিত হইলেন না; কিন্তু

১৯৩]

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী যে, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি সুশীলাকে একটা আপদ বলিয়াই মনে করিলেন। কোথাকার পথে-কুড়ান যুবতী বিধবা! তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে, ইহা তাঁহার বড় মনঃপুত হইল না। তবে কর্ত্তা মেয়েটিকে বাসায় স্থান দিতে যখন স্বীকৃত হইয়াছেন, তখন তাহাকে তিনি তাড়াইয়া দিতে পারিলেন না। বাসায় যে দুইজন দাসী ছিল, তিনি নানা অছিলায় তাহার এক-জনকে বিদায় করিয়া দিলেন; এবং বলা বাহুল্য, সুশীলা সেই দাসীর পদ অধিকার করিল। সুশীলা ইহাতেই কৃতার্থ হইয়া গেল, তাহার ন্যায় আশ্রয়হীনা যুবতী যে, এমন একটা মহদাশ্রয় লাভ করিল, ইহারই জন্য সে বিশ্বনাথের চরণে প্রণাম করিয়া দাসী-বৃত্তিতে লাগিয়া গেল। তাহার জীবনে যে এই প্রকার একটা দাসীর কার্য্যও লাভ হইবে, ইহাও সে মনে করিতে পারে নাই। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর সমস্ত কাজ সে করিয়া দিত; দিনরাত্রি সে খাটিত। পিতামাতার আদরিণী কন্যা আজ এই পরিচারিকার কার্য্য পাইয়াই কৃতার্থ হইল। হায় অবস্থা-বিপর্য্যয়! হায় রমণীর মোহ!

সুশীলা এই ব্রাহ্মণের আশ্রয়েই এক বৎসর কাটাইল;

দুঃখে কষ্টে দাসীবৃত্তি করিয়া তাহার জীবনের একটি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে ত সুখ লেখেন নাই! তাহার অদৃষ্টে যদি সুখই থাকিবে, তাহা হইলে সে অল্প-বয়সে বিধবা হইবে কেন? তাহার অদৃষ্টে যদি সুখই থাকিবে, তাহা হইলে তাহার পিতা এমন করিয়া কারাবাসী হইবেন কেন? তাহার অদৃষ্টে যদি সুখই থাকিবে, তাহা হইলে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু, আজকালকার এই স্বার্থপর দেশের মধ্যে পাইয়া তাহার মর্য্যাদা সে রক্ষা করিতে পারিল না কেন? তাহার অদৃষ্টে যদি সুখই থাকিবে, তাহা হইলে তাহার এমন ভয়ানক মতিভ্রম হইবে কেন? সে ক্ষণিক কিসের মোহে অভিভূত হইয়া পবিত্র মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া আসিবে কেন? তাহার হৃদয়ে যে পাপের সঞ্চার হইয়াছিল, সে যে বাসনার দাসীত্ব করিবার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এ কথা খুবই ঠিক। বিধবার পক্ষে ইহাই অমার্জ্জনীয় অপবাধ! এই অপরাধের জন্য তাহার উপর যে কঠিন শাস্তি, যে বিষম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল, যে প্রায়শ্চিত্ত সে এতদিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহার

অপেক্ষাও যে কঠিনতর প্রায়শ্চিত্ত তাহার উপর ভবিষ্যতে বিহিত হইয়াছে, তাহা সে জানিত না। অভাগী মনে করিয়াছিল যে, ইহার অধিক আব কি শাস্তি তাহার জন্য হইতে পারে। পরের গৃহে দাসীবৃত্তি সে করিতেছে, দিবানিশি অতীত-জীবনের কথা মনে করিয়া সে তুষানলে দগ্ধ হইতেছে;—ইহার বাড়া আরও কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তাহার মনে সামান্য একটু পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে বাসনার অগ্নি একটুমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল; সে সময়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল; সে প্রলোভন সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু,—কিন্তু সেই যে গৃহত্যাগ—ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায় পরপুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহত্যাগ—হিন্দু-বিধবার পক্ষে যে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—মহাপাপ! সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি সহজে হয়? দাসীবৃত্তিই কি যথেষ্ট? সুশীলা অনেক সময় এই কথা ভাবিত। কিন্তু তাহার মনে হইত, সে যে জ্বালায় জ্বলিতেছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট; তাহার উপর আর অধিকতর বিপদে সে পড়িবে না;—জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন তাহার এই ভাবেই চলিয়া যাইবে। কিন্তু

ভবিতব্য তাহার জন্য আরও কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুশীলা এই ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে এক বৎসর কাটাইল। এই এক বৎসরের মধ্যে সে কখনও একাকী বাড়ীর বাহির হইত না; মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর সহিত গঙ্গাস্নান বা ঠাকুর-দর্শনে যাইত। শরীরের উপর তাহার মোটেই দৃষ্টি দিল না; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যই যে তাহার কাল হইয়াছিল; এত কষ্টেও তাহার সৌন্দর্য্যলোপ হইল না। ব্রহ্মচারিণী বিধবা বহু চেষ্টা করিয়া, শরীরকে বহু প্রকারে নিগৃহীত করিয়াও সৌন্দর্য্যলোপ করিতে পারিল না।

এই সময়ে এক দিন বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার জ্বর হইল। প্রথম দুইতিনদিন আর কোন ব্যবস্থা হইল না। তৃতীয় দিনও যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন গৃহিণীর বিশেষ অনুরোধে কবিরাজ ডাকা হইল। কবিরাজ মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেকদিনের পরিচিত বন্ধু। তিনি আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "কবিরাজ, ভাবিতেছ কি? ডাক পড়িয়াছে,

কেমন? তার জন্য ত প্রস্তুত হইয়াই বাবার দ্বারে আসিয়াছি। তুমি এক কাজ কর, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্য ব্যবস্থা কর; ছেলেদের খবর দেও। পরকালের ব্যবস্থা কর।”

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “না, তেমন কিছু নয়; তবে কি না, তিনদিনের জ্বরে নাড়ীর এমন অবস্থা বড়-একটা দেখা যায় না। তবে বুড়া হাড়, সাম্‌লেও যেতে পারে।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন “সে জন্য ভাবনার দরকার নেই। ছেলেদের খবর দেও; যদি বেশী দেরী নেই বোঝ, তাহলে বরঞ্চ একটা টেলিগ্রাম্ পাঠিয়ে দেও।”

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “তা, কি জানেন, ভালমন্দ ত বলা যায় না। এখনই একটা তার পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।”

কবিরাজ তারও পাঠাইলেন, ঔষধও দিয়া গেলেন। কিন্তু ঔষধে কিছুই হইল না। তাহার পর তৃতীয় দিনে পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র পরিবৃত হইয়া, বিশ্বনাথের নাম করিতে করিতে বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সজ্ঞানে কাশীলাভ হইল।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাকে বলিলেন, “মা, এতদিন বাবা

ছিলেন, তুমি এখানে ছিলে। এখন ত আর তোমাকে এখানে একলা রেখে যেতে পারিনে। আমাদের সঙ্গে তুমিও দেশে চল।"

গৃহিণী বলিলেন "তা হবে না বাবা! আমি আর দেশে যাব না। বাবার স্থান ছেড়ে আর যাব না। আমি বুড়ামানুষ; এখানেই থাক্‌ব। আর কয় দিনই বা বাঁচ্‌ব। যে কয়দিন আছি, এখানেই থাকি। চাকর-বাকর আছে, সুশীলা আছে, আমার জন্য কোন ভয় নেই। সময়মত তোমাদের খবর দেব; আর ছুটীটুটি পেলে তুমি এসে এক-একবার দেখে যেও।"

জ্যেষ্ঠ-পুত্র বলিলেন "তুমি যাই বল না কেন মা, তোমাকে এমন অবস্থায় একলা রেখে যেতে আমার মন সর্‌ছে না।"

কনিষ্ঠ-পুত্র রমেশ বলিল "আচ্ছা দাদা, এক কাজ করা যাক্‌ না কেন? আমি ত বাড়ীতেই বসে' আছি। আমিই দিনকয়েক মায়ের কাছে থাকি; তার পর যা হয় ব্যবস্থা করো।"

দাদা বলিলেন, "হুঁ, তুই আবার মাকে দেখ্‌বি! তুই যদি মানুষ হ'তিস্‌, তাহ'লে ত কথাই ছিল না। তোকে ত কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে বলিনে; তুই যদি শান্তভাবে ভাল হ'য়ে বাড়ী

থাকিস্, তা হলেই কত কাজ হয়; আমাকে আর নানা জায়-গায় দৌড়ুতে হয় না।”

রমেশ বলিল “না দাদা, তুমি দেখে নিও, আমি এখানে বেশ ভালভাবে থাকব; তুমি দেখে নিও।”

দাদা বলিলেন, “তাহ’লে বৌমাও এখানেই থাকুন; কি বল মা?”

রমেশ বলিল “তাহ’লে আমি এখানে থাকব না। ও সব জঞ্জাল, গোলমাল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যে তোমরা যাবে, তা হবে না।”

মাতা বলিলেন “না বাছা, তোমাদের কারও এখানে থেকে কাজ নেই; আমি একলা বেশ থাকতে পারব।”

অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, গৃহিণী ও তাঁহার পুত্র রমেশ আপাততঃ কিছু দিন কাশীতে থাকিবেন, আর সকলে দেশে চলিয়া যাইবেন। দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুইচারি দিন আগে-পাছে দেশে গেলেন।

রমেশ দুইচারি দিন বেশ ভালভাবেই থাকিল; কিন্তু যে এতকাল কুসঙ্গে কাটাইয়াছে, সে কি সহজে, এত শীঘ্র, অনায়াসে সে পথ ত্যাগ করিতে পারে? বয়স যখন তার ১৭ বৎ-

সর, তখন হইতে সে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে; তাহার পর ক্রমে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, তাহারও আবকারী বিভাগে 'প্রোমোসন' হইতে লাগিল—সে আবকারীর প্রায় সকলগুলি দ্রব্যেরই রীতিমত সেবক হইয়া পড়িল। লেখাপড়া গ্রামের বিদ্যালয়ের তৃতীয়-শ্রেণী পর্য্যন্ত। তাহার এই দুশ্চরিত্রের কথা ভাবিয়াই তাহার দাদা তাহাকে কাশীতে রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলের পরামর্শ-মতই নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে তিনি রমেশকে কাশীতে রাখিয়া গেলেন।

রমেশ দুইচারি দিন পরেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, মদ গাঁজা প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া দিল। বাড়ীতে দাসদাসী যাহারা ছিল, তাহারা ছোট-বাবুর এই কার্য্যে কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; আর তাহাদের প্রয়োজনই বা কি! কিন্তু একজন রমেশকে দেখিয়া প্রথম হইতেই ভয় পাইয়াছিল—সে সুশীলা। দুই-একজন এমন লোক আছে, যাহাদিগকে দেখিবামাত্রই মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, এবং পরে দেখিতেও পাওয়া যায় যে, সে ত্রাস অকারণ নহে। পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া রমেশ যে দিন আর সকলের সঙ্গে কাশীতে

আসিয়াছিল, সেই দিন তাহাকে দেখিবামাত্রই সুশীলার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,—সে রমেশের সম্বন্ধে কর্ত্তা বা গৃহিণীর নিকট ইতঃপূর্ব্বে কোন কথাই শোনে নাই—তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না; অথচ রমেশের চেহারা দেখিয়াই সুশীলা বুঝিয়াছিল যে, এ লোকটা ভাল নহে।

সুশীলা যাহা মনে করিয়া ভীতা হইয়াছিল, দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই তাহার উপক্রম সে দেখিতে পাইল। রমেশের চালচলন, রমেশের কথাবার্ত্তা, রমেশের হাবভাব তাহার নিকট ভাল ঠেকিল না। সে যুবতী, সে বিধবা, সে তাহাদের আশ্রিতা, রক্ষণীয়া; তাহার প্রতি যে প্রকার সদয় ও সসম্ভ্রম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, রমেশের মধ্যে তাহার কিছুই দেখা গেল না। সে হয় ত তাহাকে আর দশজন অসচ্চরিত্রা দাসীর মতই মনে করিয়াছিল। সে সুশীলা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই জানিত না—সুধু জানিত যে, তাহার পিতা সুশীলাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। কাশীর পথ হইতে যে যুবতী বিধবাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে, তাহার আবার মর্য্যাদা কি? সে নিশ্চয়ই আর দশজনেরই মত। রমেশ এই কথাই প্রথম হইতে ভাবিয়া লইয়াছিল; সুতরাং সে সুশীলার প্রতি যে

পাপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, তাহা তাহার মত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যুবকের পক্ষে আশ্চর্য্যের কথা নহে।

সুশীলা এই বিপদের কথা বেশ বুঝিতে পারিল; ছোট-বাবু যে ভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করে, তাহা সে মোটেই পসন্দ করে না; অথচ কথাটা মুখ-ফুটিয়া বলিতেও তাহার সাহসে কুলায় না। আর বলিবেই বা কাহাকে? যাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সে বৎসরাধিক কাটাইয়াছে, তাঁহাদের একজন চলিয়া গেলেন। গৃহিণী তাহার উপর কোন দিনই সদয় ছিলেন না; তবে তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইত এবং তাহার স্বভাব-চরিত্রেও কোন দোষ দেখিতে পান নাই, তাই বাড়ীতে এতদিন রাখিয়াছিলেন। তাহার ত আর এখানে বাস করিবার কোন অধিকার নাই। সে যদি গৃহিণীর নিকট তাঁহার ছোট-ছেলের সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিতমাত্র করিতেও সাহস করে, এবং গৃহিণী যদি সেই কথা শুনিয়া তাহাকে বলেন 'তোমার ইচ্ছা না হয় অন্যত্র চলিয়া যাও' তাহা হইলে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? এই সকল কথা ভাবিয়াই সুশীলা সমস্তই সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল এবং অতি সাবধানে থাকিল। কিন্তু যাহার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে

হয়, যাহার সহিত দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় দেখা করিতে হয়, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া কোন লাভই নাই।

— রমেশ প্রথম প্রথম অতি গোপনে, আকার-ইঙ্গিতে সুশীলার প্রতি তাহার কুভাব জ্ঞাপনের চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহাতে যখন কোন ফল হইল না, তখন সে আরও একটু অগ্রসর হইল। সুশীলার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে আরম্ভ করিল। সে সকল ব্যাপারের খুটিনাটি আর লিপিবদ্ধ করিয়া কাজ নাই। সেই সকল কথা বর্ণনা করিলে যাঁহারা তৃপ্ত হইবেন না, তাঁহারা এই লেখককে ক্ষমা করিবেন: তাঁহাদের তৃপ্তিদানের জন্য এ কাহিনী বর্ণিত হইতেছে না। যুবতী বিধবাকে যে কত প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, মনের একটু চাঞ্চল্য, কার্য্যের একটু ত্রুটীর জন্য তাহাকে যে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহারই একটা বিবরণ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পাপের নগ্নমূর্ত্তি পাঠকের নেত্র সম্মুখে উপস্থাপিত করার কোনই প্রয়োজন অনুভূত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও পুনঃপুন বলিতেছি, 'বাস্তবতার' নামে এই প্রকারের নগ্নচিত্র, বীভৎস-দৃশ্য

দেখাইয়া কোন লাভই নাই; ইহাতে বরঞ্চ অহিতই সাধিত হয়।

থাকুক্ সে কথা; আমরা আমাদের গন্তব্য-পথে অগ্রসর হই। রমেশ সুশীলার উপর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়া-ইতে লাগিল। সুশীলা প্রথম প্রথম রমেশের কোন কথাতেই কর্ণপাত করিত না। তাহার পর সে যখন আরও একটু অগ্র-সর হইল, তখন সুশীলা একদিন তাহার পায়ে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিয়াছিল; সে যে ও প্রকার চরিত্রের স্ত্রীলোক নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য সুশীলা যত কথা বলিতে হয়, যত ধর্ম্ম দেখাইতে হয়, সমস্তই করিয়াছিল; কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' রমেশ সুশীলাকে করগত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল; সুশীলার অবাধ্যতা দেখিয়া রমেশ ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। অবশেষে এক রাত্রিতে রমেশ একেবারে সুশীলাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সুশীলা এত দিন সহ্য করিয়াছে—নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া সে অনেক সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা আছে। রমেশ যে দিন সেই সীমা অতিক্রম করিতে গেল—সুশীলার উপর বলপ্রকাশের চেষ্টা করিল, সে দিন এই দুর্বৃত্ত যুবককে

তাহার উপযুক্ত শাস্তি—পদাঘাত প্রদান করিয়া সুশীলা সেই অন্ধকার রাত্রিতে একাকিনী, একবস্ত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহত্যাগ করিল। সুশীলার পদাঘাত লাভ করিয়া রমেশ ভূপতিত হইয়াছিল; সে গা-ঝাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সুশীলা বাড়ীর বাহির হইয়া, যেদিকে তাহার দুই চক্ষু গেল, সেইদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল! রমেশ রাজপথে আসিয়া তাহার আর সন্ধান পাইল না; এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া, বিফল-মনোরথ হইয়া সে বাসায় ফিরিয়া গেল এবং পরদিন সুশীলাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে, স্থির করিল।

এ দিকে সেই অনাথিনী, অভাগী সুশীলা কাশীর পথে একাকিনী বাহির হইল। আজ প্রায় বৎসরাধিক কাল সে কাশীতে আছে; কিন্তু এতদিনের মধ্যে সে অপর গৃহস্থের নিকট পরিচিত হয় নাই। সে নীরবে দাসীবৃত্তিই করিয়া আসিয়াছে; গৃহিণীর সঙ্গ ব্যতীত সে কোনদিন কাশীর পথে বাহির হয় নাই। আজ এই অন্ধকার রাত্রিতে পথে বাহির হইয়া চাহিয়া দেখিল চারিদিকে ঘোর অন্ধকার; বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষাও তাহার ভিতরের অন্ধকার গাঢ়তর! সেখানে সামান্য

একটা তারকাও আলো দিবার চেষ্টা করিতেছে না। তাহার মনে হইল, গভীর অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে পথের পার্শ্বে এক অন্ধকারস্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ কি ভাবিল; তাহার পর সে গঙ্গার দিকে চলিল। এ পথটা তাহার জানা ছিল; এই কাশীতে সে দুইটা পথ চিনিত—এক বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের পথ; আর এক পতিতপাবনী গঙ্গার পথ। আজ এই অসহায় অবস্থায় সে এই দ্বিতীয় পথই ধরিল। তাহার মত অভাগীর পক্ষে, তাহার মত পরিত্যক্তার পক্ষে যে ঐ পতিতোদ্ধারিণী, কলুষনাশিনী সুরধুনীই একমাত্র পথ। আজ সেই পথের কথাই তাহার মনে হইল। সেই জগন্মাতার বক্ষে মাথা রাখিয়া সকল সন্তাপ, সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে চিরশান্তি লাভের কথা, আজ এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, তাহার মনে হইল। সে তখন দ্রুতগতিতে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইল।

গঙ্গার পথ তাহার অপরিচিত ছিল না; সে সোজাপথেই গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। দশাশ্বমেধ ঘাটে তখন দুই একজন লোক সিঁড়ির উপর বসিয়া

ছিল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে ছোট ছোট তারকা ধীরে ধীরে একটু একটু আলোক দিবার চেষ্টা করিতেছে; সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী কুলকুলস্বরে আপন মনে গান করিতে করিতে সাগর-উদ্দেশে ছুটিয়া চলিতেছেন। নদীর অপর পারস্থিত দুইএকখানি নৌকার ক্ষীণ আলো এপার পর্য্যন্ত আসিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ! সুশীলা এই ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; সর্ব্বসন্তাপহারিণী তাহার শরীরের, তাহার মনের সন্তাপ দূর করিবার জন্য তাহার গাত্রে সমীর-প্রবাহ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। সুশীলা আজ যেন বুঝিতে পারিল যে, এতদিন সে যে পথের সন্ধান পায় নাই—আজ এতকাল পরে জননী তাহাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; আজ মাতা তাহাকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সুশীলা ভাবিল, এই ত পথ—এই ত সকল শোক-তাপ, সকল গ্লানি, সকল মলিনতা মুছিয়া ফেলিবার স্থান। মায়ের কোল ছাড়িয়া, এমন শীতল, শান্তিদায়িনী আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সে আশ্রয়লাভের জন্য কাহার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল? সে যেন শুনিতে পাইল, কে তাহাকে স্নেহমাখা স্বরে ডাকিতেছে "আয় বাছা, আয়, আমার বুকে

আয়; তোর সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।” সুশীলা কাণ পাতিয়া এই আহ্বান শুনিতে লাগিল। তাহার বেশ মনে হইল, চারিদিক হইতে তাহাকে ডাকিতেছে 'আয়, আয়!'

সুশীলা তখন সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহার আর তখন ভয় নাই; সে যে আজ অভয়ার ডাক শুনিয়াছে—সে যে আজ গন্তব্য-স্থানের সন্ধান পাইয়াছে। ক্রমে সে জলের ধারে গেল। তখন গললগ্নীকৃত-বাসে নতজানু হইয়া ভাগীরথীকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া করযোড়ে বলিল, “মা, বড় কষ্ট পাইয়াছি; একদিনের মোহে, একদিনের ভুলে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি মা! আর কোথাও যাইব না; তুমি আমাকে স্থান দেও মা!” এই বলিয়া সে জলে নামিল। যখন সে বুকজলে নামিয়া গেল, তখন তাহার বোধ হইতে লাগিল, তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল;—তাহার হৃদয় শীতল হইল। সে তখন এক অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া মাথায় দিতে লাগিল। অবশেষে যুক্তকরে তারস্বরে বলিল “মাগো, তোমার সন্তানকে কোলে লও মা!” এই বলিয়া সে ডুব দিল।

২০৯]

ঘাটের এক-পার্শ্বে সোপানের উপর একটি লোক বসিয়া ছিল। সে এতক্ষণ সুশীলার কথা শুনিতেছিল। সুশীলা শেষ কথাটি বলিয়া যখন জলে ডুব দিতে গেল, তখন সে লোকটা—সে এক জন সন্ন্যাসী—তাড়াতাড়ি জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুশীলা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সুশীলা ডুব দিয়া যখন আর উঠিল না, তখন সেই সন্ন্যাসী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুশীলা যেখানে ডুবিয়াছিল, সে স্থান সে অনুসন্ধান করিল। সেখানে তাহাকে পাইল না। তখন সন্ন্যাসী স্রোতের অনুকূলে ডুব দিয়া দিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার চেষ্টা বৃথা হইল না; প্রায় পাঁচ মিনিট অনুসন্ধানের পর সন্ন্যাসী সুশীলার দেহ পাইল। সুশীলা বেশী দূরে যাইতে পারে নাই। তাহার দেহ সিঁড়ির পার্শ্বে জলের মধ্যে একখানি পাথরে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী সুশীলার সংজ্ঞাশূন্য দেহ টানিয়া আনিয়া সিঁড়ির উপর তুলিল; তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার দেহে এখনও প্রাণ আছে। সন্ন্যাসী তখন কৃত্রিম উপায়ে তাহার উদরস্থ জল বাহির করিবার চেষ্টা করিল; শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া পুনরায় আনিবার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, সন্ন্যাসী

তাহা জানিত। সে তাহাও করিল। তাহার পর যখন সে দেখিল, আর কোন ভয় নাই, তখন সুশীলার সেই সংজ্ঞাশূন্য দেহ নিজের স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সেই অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

---

[২৭]

দীনেশ ও সতীশের সংবাদ অনেক দিন লওয়া হয় নাই; সুশীলার কথাতেই আমরা নিবিষ্ট ছিলাম। এইবার তাহাদের কথা বলিতে হইতেছে।

দীনেশের কারাবাসের পর সতীশ তাহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত; তাহাতেই দীনেশ তাহার স্ত্রী ও কন্যার সংবাদ পাইত। সুশীলা যখন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সতীশ যখন সুশীলার মাতাকে সাজাহানপুরে লইয়া গেল, তাহার পর হইতে সতীশ দীনেশকে যে সকল পত্র লিখিত, তাহাতে সে সুশীলার নিরুদ্দেশের সংবাদ একদিনও দেয় নাই। দীনেশকে পত্র লিখিতে সতীশ মিথ্যা-কথাই ব্যবহার করিত; সুশীলা ভালই আছে, এই কথাই এতদিন দীনেশ শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন প্রকৃত কথা গোপন করা উচিত কি না, এই চিন্তা সতীশের মনে উদিত হইল। দীনেশের কারাবাসের পর ষোল মাস অতীত হইয়া গিয়াছে; সতীশ দীনেশের জরিমানার একহাজার টাকাও পাঠাইয়া দিয়াছে। দীনেশ কারাগারে ভালভাবে ছিল, কোন প্রকার বে-আইনী কাজ করে নাই; তাই আই-

নের বিধানমতে তাহার দুই বৎসরের কারাদণ্ডের দুই মাস কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং আর দুই মাস পরেই দীনেশ কারামুক্ত হইবে।

এতদিন সতীশ সুশীলার কথা লইয়া তাহার মাতার সহিত কোন আলোচনা করে নাই; সুশীলার মাতাও একদিনের জন্যও মেয়ের নামও মুখে আনেন নাই। সতীশের আদেশ অনুসারে বাড়ীর কেহই সুশীলার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ কখনও তাহার মায়ের সম্মুখে করে নাই। এখন দীনেশের কারামুক্তির সময় আসিয়া পড়িল; এ সময় তাহাকে প্রকৃত কথা জানাইবার ইচ্ছা সতীশের হইল। তাই সে একদিন দীনেশের স্ত্রীকে ডাকিয়া নানা কথার পর ঐ কথা উত্থাপন করিল। দীনেশের স্ত্রী একেবারে সতীশের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। সতীশ এবং তাহার স্ত্রী দীনেশের স্ত্রীকে বাড়ীর কর্ত্রী করিয়া দিয়াছিলেন; দীনেশের স্ত্রীকে তাহারা বড়-ভগিনীর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। দীনেশের স্ত্রী যে কায়স্থের কন্যা, এ কথা তাহারা কখনও মনে করিত না; বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও দীনেশের স্ত্রীকে "জেঠাই-মা" বলিয়াই ডাকিত। নিজের সুন্দর স্বভাবের গুণে দীনেশের স্ত্রী সকলকে আপনার জন

করিয়া লইয়াছিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান নাই—সে কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত; কিন্তু তাহা তিনি হৃদয়ের মধ্যেই পোষণ করিতেন; কোন দিন মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলেন নাই।

আজ হঠাৎ সতীশের মুখে সুশীলার কথা শুনিয়া তাঁহাব শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। এতদিন তিনি যে বেদনা অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন, আজ সতীশের কথায় সেই গভীর বারিধি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল; তিনি যে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সতীশও হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইল।

অনেক কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া সুশীলার মাতা বলিলেন, "ঠাকুর-পো, আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন, এখনও করছেন, আমার যদি মায়ের পেটের ভাই থাকৃত, আমার বাবা মা যদি বেঁচে থাকৃতেন, তাহ'লে তাঁরাও এতখানি কর্‌তেন কি না, সন্দেহ। আপনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে আমার কেহ ছিলেন; আপনার ঋণ আমরা জীবন দিয়েও শোধ কর্‌তে পারব না। কিন্তু আমি বড়ই অভাগী; তাই বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনি

অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, আমি সুশীলার কথা একদিনের জন্যও ভুলতে পারি নাই। সে যে আমার একমাত্র সন্তান! মুখে যতই বলি না কেন, এমন দিন যায় নাই, যে দিন তার কথা মনে হয় নাই। তার যে কি হলো, সে বেঁচে আছে, কি মরে গিয়েছে, তাও জান্‌তে পারলাম না। সে আমাদের মুখে কালি দিয়েছে; তার খোজখবর করা কিছুতেই উচিত নয়, তা জানি। তবুও মায়ের প্রাণ—বোঝে না। সে যে এমন কাজ করবে, তা কি ঠাকুর-পো, কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম। সবই আমার অদৃষ্টের দোষ! আর অদৃষ্টেরই বা দোষ দিই কেন, সবই আমার অপরাধ। আমি যদি আপনার পরামর্শ শুন্‌তেম, তাহ'লে কি আর এমন হয়। ভগবান তার শাস্তি আমাকে খুব দিয়েছেন।"

সতীশ বলিল, "আমিও কত সময় মনে করেছি, সুশীলার খোজ নেব; কিন্তু পাছে আপনি রাগ করেন, তাই কোন খোজ নিই নাই। এখন দীনেশ আস্‌ছেন, তাঁকে এই খবরটা আগে থাকৃতে দেব কি না, তাই ভাব্‌ছি।"

সুশীলার মাতা বলিলেন, "না, খবব না দিয়ে ভালই করেছেন। হয় ত কি ভয়ানক সংবাদ পাওয়া যেত; তাতে

কষ্ট আরও বাড়্‌ত। তাই ভেবেই ত আমি কোনদিন সে কথা তুলি নাই। আজ আপনি কথাটা বল্‌লেন, তাই মনের আবেগে কথা কয়টি বলে ফেলেছি। সত্যিই ত, সে মেয়ের কি খোঁজ নিতে আছে? তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? তাঁকে এই খবরটা দেওয়া কি উচিত হবে? তিনি এখানে এলে কথাটা শুন্‌বেন, সেই ভাল; তখন আপনারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন। তিনি যদি আগে থাক্‌তেই খবরটা পান, তাহ'লে এমনও হ'তে পারে যে, তিনি আর আস্‌বেন না, কোন্ দিকে চ'লে যাবেন। যে কয়দিন খবরটা না পান, সেই ভাল।"

সতীশ বলিল, "তবে তাই হ'ক্। দীনেশকে আন্‌বার জন্য আমি নিজেই কল্‌কাতায় যাব। তাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আস্‌ব; কি জানি, জেল থেকে বেরিয়ে সে যদি কোন দিকে চ'লে যাবারই মতলব করে। আমি যে তাকে আন্‌বার জন্য কলিকাতায় যাব, সে কথা তাকে কা'লই লিখে দেব।"

সতীশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে ডাকপিয়ন ডাকিল "বাবুজি, চিঠি হ্যায়।"

সতীশ বাহিরে যাইয়া চিঠি হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে

আসিয়া বলিল, "দীনেশের নাম করতে করতেই তার চিঠি এল। দেখি, সে কি লিখেছে।"

সতীশ চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল; তাহার পর চিঠিখানি দীনেশের স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, "দীনেশ ভালই আছে।"

দীনেশের চিঠিখানি এই—

"ভাই সতীশ,

অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ত শেষ হইয়া আসিল। আর একমাস পরেই আমি জেল হইতে খালাস পাইব। কিন্তু তাহার পর? আমি আজ প্রায় দুইবৎসর ধরিয়া আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিয়া আসিতেছি। যখনই ভাবিতে বসি, তখনই আর কূলকিনারা পাই না। জীবনে অনেক অপরাধ করিয়াছি; তাহার ফল ত ভোগ করা চাই! আমি যে কারাদণ্ড ভোগ করিলাম, তাহাই আমার ন্যায় দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, তস্করের পক্ষে যথেষ্ট নহে; আমি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর দণ্ডলাভের যোগ্য। আমার জীবনের কথা চিন্তা করিয়া আমি ত মনে করি, আমার ন্যায় হতভাগ্য জীব এ সংসারে আর নাই।

আমার কি ছিল না? আমি লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম;

আমি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলাম; তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু আমার আছে, পতিপ্রাণা স্ত্রীর আমি স্বামী। আমার ত কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব শুধু ছিল আমার চরিত্র-বলের; তাই আমি নরকে পড়িয়াছিলাম; তাই আমি পথ ভুলিয়াছিলাম। সেই সময় তোমার মত যদি একজন বন্ধু আমার কাছে থাকিত, তাহা হইলে সতীশ, আমার এ দশা হইত না; আমি এমন ঘৃণ্য, জঘন্য, কারাদণ্ডভোগী, সর্ব্ব-জন-পরিত্যক্ত, মানুষ নামের কলঙ্ক হইতাম না।

কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আর আমার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে না; জীবনে আর শান্তিলাভ করিতে পারিব না। কিন্তু, এখন ভাবনা এই যে, জেল হইতে বাহির হইয়া কি করিব? একবার মনে হইতেছে, আর তোমা-দের কাছে মুখ দেখাইব না; তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে আমার ইচ্ছা করে না। কিন্তু পরক্ষণেই সুশীলার কথা মনে হইয়া আমার সকল সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার যে এ জগতে কিছুই নাই; তাহার জীবন যে অন্ধকারময়! ভাই সতীশ, আমি পাষণ্ড হই, চোর হই, মদ্যপায়ী হই, আর যাই হই; সুশীলাকে দেখিলে আমি ক্ষণকালের জন্য শান্ত হইতাম।

তাহাকে সুখী করিবার জন্য আমি অবস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলাম ; তাহার একটুও কষ্ট হইবে মনে হইলে আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িতাম। আমি তাহাকে সচ্চরিত্র. শিক্ষিত, ধনী সন্তানের সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অভিশপ্ত অদৃষ্টের দোষে, তাহার সকল সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল ; মা আমার চিরদুঃখিনী হইল। ভাই সতীশ. সুশীলাই আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন। কিন্তু তাহাকে লইয়া কি করিব ? এ জীবনে তাহার জন্য আমি কি করিতে পারি ? যদি কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে সুশীলা ও তাহার মাতাকে লইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাশীতে কাটাইতাম ; সুশীলাকে ধর্ম্মালোচনায়, পূজা-অর্চ্চনায় নিবিষ্ট করিয়া তাহার মনকে শান্ত করিবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু তাহা ত হইবার যো নাই। আমি যে একেবারে কপর্দ্দকহীন ; আমার স্ত্রী-কন্যার ভার যদি তুমি গ্রহণ না করিতে, আমাকে যদি এই বিপদের সময় তুমি সাহায্য না করিতে, তাহা হইলে তাহারা কোথায় ভাসিয়া যাইত, কে বলিতে পারে ? হয় ত তাহারা একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিত, হয় ত তাহারা

অনাহারে পথিপ্রান্তে মারা যাইত। তুমি যাহা করিয়াছ ভাই, তাহা একালে কেহ করে না। আমি তোমার কে? তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ। তোমার সঙ্গে এক স্কুলে পড়িয়াছিলাম, তুমি আমার স্বগ্রামবাসী—এই ত সম্পর্ক,—এই ত বন্ধন! কিন্তু এখন যে পুত্র পিতার ভার লয় না; ছোট-ভাই অনাহারে সপরিবারে কষ্টে পাইলেও, ধনী, অবস্থাপন্ন বড়-ভাই তাহার মুখের দিকে চায় না। এই ভয়ানক সময়ে, এই হৃদয়-হীন দেশে তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, আমার বাপ-ভাই থাকিলেও তাঁহারা এমন করিতেন কি না, সন্দেহ! যাক্, সে কথা আর বলিয়া কাজ নাই; চিরজীবন যাহার গুণগান করিলেও ফুরায় না, জন্মজন্মান্তর যাহার দাসত্ব করিলেও ঋণ-শোধ হয় না, তাহার কথা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব?

এখন প্রধান কথা কি জান? আমি অতঃপর কি করিব? সুশীলা ও তাহার মাতা আমার পথ-চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আমার মত হতভাগ্য পিতা, স্বামী তাহাদের কি করিতে পারে? সুশীলাই আমার প্রধান ভাবনার বিষয়। তাহার কি করা যায়? সে ত এতদিন তোমার কাছে রহিয়াছে। তাহার জীবনকে কোন্ পথে চালিত করা যায়, তাহা কি তুমি

ভাবিয়া দেখিয়াছ ? দেখ, কাশীতে, কি অন্য কোন তীর্থস্থানে আমার কি একটা কাজকর্ম্ম করিয়া দিতে পারিবে না ? আমি বড় চাকুরী চাহি না, আমি অর্থের লোভ করিতেছি না ; কোন রকমে এই তিনটী প্রাণীর একবেলা সামান্য শাকান্ন জোটে, তাহারই মত একটা চাকুরী কি সংগ্রহ করিয়া দিতে পার না ? মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ভাই সতীশ, একদিন আমি কুড়ি পঁচিশ টাকা চাকরকে বক্‌সিস দিয়াছি, এক এক দিন কুকার্য্যে বিশ পঞ্চাশ একশত টাকা পর্য্যন্ত জলের মত উড়াইয়াছি! সেই আমি এখন পরিবার-প্রতিপালনের জন্য মাসে কুড়িটি টাকার জন্য লালায়িত !

সেই ভাল, সতীশ, সেই ভাল ! তুমি চেষ্টা করিলে এটুকু নিশ্চয়ই করিতে পারিবে। তাহাই স্থির করিও। আমি, সুশীলা ও তাহার মাতাকে লইয়া তীর্থস্থানেই বাস করিব। চাকুরী করিব এবং অবসর-সময়ে সুশীলাকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিব, পূজা-অর্চ্চনা করিব; তাহাকে আমি প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী করিব। আমার জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আর কোন উচ্চ আশা নাই ; জীবনান্ত পর্য্যন্ত সুশীলাকে লইয়া থাকাই আমার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইবে।

তবে তাহাই ঠিক রহিল। আমি কারামুক্ত হইয়াই তোমার কাছে চলিয়া যাইব। তুমি আমার গাড়ীভাড়ার টাকা এই জেলের সুপারিণ্‌টেনডেণ্টের নিকট মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইও। আমি জেল হইতে বাহির হইয়া একেবারে বরাবর হাবড়া ষ্টেসনে যাইব এবং সেখানে প্রথমে যে গাড়ী পাইব, তাহাতেই সাজাহানপুর যাত্রা করিব। আমার দুঃখিনী স্ত্রী, আমার অনাথিনী কন্যা যে আমার পথ-চাহিয়া বসিয়া আছে! আমি কি আর বিলম্ব করিতে পারি!

চিঠিখানি বড় হইয়া গেল; কিন্তু কি করিব ভাই, তোমাকে কত কথা লিখিতে ইচ্ছা করে। এই কটা দিন কাটিয়া গেলেই হয়; তাহা হইলেই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া, সুশীলাকে বুকে ধরিয়া আমার ক্ষুধিত চিত্ত শান্ত করিব। ইতি

তোমার হতভাগ্য

দীনেশ।"

পত্রখানি পড়িয়া দীনেশের স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! হতভাগ্য! কি

আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তুমি সুদীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াই দৌড়িয়া আসিতেছ। কিন্তু তোমার জন্য যে বজ্র রহিয়াছে, তাহা যে অকস্মাৎ তোমার মস্তকে পড়িয়া তোমাকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিবে, সে সম্ভাবনাও ত তোমার মনে হয় নাই।

সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "বৌদিদি, কি হবে?"

সুশীলার মাতা বলিলেন "কি হবে ঠাকুর-পো? আপনি ত তাঁকে আন্‌তে যেতে চাচ্ছেন। বেশ তাই কর্‌বেন; রেলে আস্‌তে আস্‌তে কথাটা তাঁকে বলবেন।"

সতীশ বলিল "সে আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না; তা আমি কোনমতেই পারব না। এতদিন যে মিথ্যা কথা ব'লে তাকে ভুলিয়ে রেখেছি, সে ভুল আমি ভাঙ্গতে পারব না, এমন বজ্রাঘাত আমি করতে পারব না। আমি তাকে বাড়ীতে এনে দেব, তারপর যা হয় হবে। সুশীলা যে এমন করবে, তা কে জান্‌ত? আমার সুধু ভয় হচ্চে বৌ-দিদি, হঠাৎ এই আঘাত পেয়ে দীনেশ একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে, তার প্রাণ বেরিয়ে না যায়!"

সুশীলার মাতা বলিলেন "সে কথা আর ভেবে কি কর্‌বেন। ভগবান যা করবেন, তাই মাথা পেতে নিতে হবে। এই যে সুশীলা এমন ক'রে কূলে কালী দিয়ে চ'লে গেল, তাও ত *সয়েছি। সব সবে ঠাকুর-পো, সব সবে। আমি যে পাষাণী! আমার মত অভাগীর সব সহ্য হবে।"

[২৮]

সন্ন্যাসী সুশীলাকে সেই রাত্রিতে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। তাঁহার আশ্রম দশাশ্বমেধ-ঘাট হইতে অনেক দূরে, একপ্রকার সহরের বাহিরে বলিলেই হয়। আশ্রমে সন্ন্যাসীর তিন চারিটি চেলা আছে; তাহারা সকলেই যুবক,—হিন্দুস্থানী। সন্ন্যাসী কিন্তু হিন্দুস্থানী নহেন, তিনি বাঙ্গালী; দেখিলে বোধ হয় বয়স ৪০।৪৫। সন্ন্যাসী আজ প্রায় দশ বৎসর এই স্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। চেলারা ভিক্ষা করে, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থেরা নানা সময়ে নানা দ্রব্য দিয়া যায়; তাহারই দ্বারা আশ্রমের লোক-দিগের সেবা চলে।

সুশীলাকে এই দীর্ঘপথ বহিয়া আনিয়া সন্ন্যাসী যখন তাহাঁকে আশ্রমের অঙ্গনে নামাইলেন, তখন আশ্রমের আর সকলে নিদ্রাভিভূত। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং সকলে মিলিয়া সুশীলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর সুশীলা একবার চক্ষু চাহিয়া বলিল "মা—মাগো।" তাহার পরেই আবার চক্ষু মুদিল; তাহার সংজ্ঞা-

লোপ হইল। শেষরাত্রিতেই সুশীলার জর হইল। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সকলে এই অপরিচিতা, সংজ্ঞাশূন্যা যুবতীর প্রাণরক্ষার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল।

* সাতদিন অচেতন থাকিবার পর সুশীলার জ্ঞানসঞ্চার হইল, কিন্তু তখনও তাহার জ্বর-ত্যাগ হয় নাই; জ্বরের প্রকোপ সমভাবেই আছে। সুশীলা একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এক মাসের উপর ভুগিয়া সুশীলার জ্বর-ত্যাগ হইল; কিন্তু সে এমন দুর্ব্বল যে, বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারে না। সন্ন্যাসীদিগের যত্ন, চেষ্টা ও শুশ্রূষার ক্লান্তি নাই। বিশেষতঃ, তাহাদিগের মধ্যে একজন ত দিন নাই, রাত নাই, সুশীলার শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া থাকে; তাহার যখন যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই করিয়া দেয়। এই সন্ন্যাসীর নাম আত্মানন্দ। আশ্রমের অধিকারী সন্ন্যাসী মহাশয় এই হিন্দুস্থানী যুবক আত্মানন্দকে অত্যন্ত ভাল বাসেন; আত্মানন্দও প্রভুর অত্যন্ত অনুগত। আশ্রমে যে কয়জন সন্ন্যাসী-চেলা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আত্মানন্দই ভাল লোক; সে সাধুদিগের মত গাঁজা, সিদ্ধি খায় না; অকারণ সাধুগিরি ফলায় না; সর্ব্বদা পাঠে নিযুক্ত থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন

আত্মানন্দ বেদান্ত পাঠ করিত। তাহার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ বৎসর।

এই সাধু যুবকের অবিশ্রান্ত চেষ্টাতেই সুশীলার যে জীবন-রক্ষা হইল, তাহা সুশীলাও বুঝিতে পারিয়াছিল। সে যখনই চক্ষু মেলিত, তখনই দেখিতে পাইত, আত্মানন্দ তাহার পার্শ্বে একখানি পৃথক আসনে বসিয়া আছে; সুশীলার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, আত্মানন্দ তখনই তাহা যোগাইয়া দিত; এমন কি সুশীলার যে দ্রব্য প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া সে মনে করিত, তাহা আগে হইতেই আনিয়া রাখিত। সুশীলা এই যুবক-সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, স্বয়ং বাবা বিশ্বেশ্বর তাহার প্রাণরক্ষার জন্যই তাহার পার্শ্বে দিবানিশি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

সুশীলা ক্রমে সুস্থ হইতেছে; এখন সে বিছানার উপর বসিতে পারে। যে সন্ন্যাসী তাহাকে গঙ্গাগর্ভ হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই সুশীলাকে দেখেন এবং একদিন নির্জ্জনে তাহার পরিচয়ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সুশীলাকে বলিয়াছিলেন "তুমি আর সংসারে ফিরিয়া যাইও না। আমি তোমাকে দীক্ষাদান করিব, তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করিয়া এই আশ্রমেই থাকিও।" সুশীলা তাহাতেই সম্মত হইয়াছিল।

এতদিনের মধ্যে আত্মানন্দের সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত সুশীলার অন্য কোন সম্বন্ধেই আলাপ বা কথা-বার্ত্তা হয় নাই। এখন সুশীলা ক্রমে সুস্থ হইতেছে দেখিয়া আত্মানন্দ একদিন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুশীলা অতি কাতরভাবে বলিল "বাবাজি, আমার পূর্ব্ব-পরিচয় নাই। আপনারা আমাকে নূতন জীবন দিয়াছেন। পূর্ব্বের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

আত্মানন্দ বলিল "ইচ্ছা করিলেই কি পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারা যায়। স্বামীজির মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তুমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলে। তোমার এমন কি দুঃখ যে, তার জন্য তুমি প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলে?"

সুশীলা বলিল "বাবাজি, তুমি তাহা বুঝিবে না। তুমি সাধু ব্যক্তি; তোমার সে সকল কথা শুনিয়া কাজ নাই।"

আত্মানন্দ সে দিনের মত নিরস্ত হইল। তাহার পর একদিন অপরাহ্ণকালে সুশীলা কুটীরদ্বারে বসিয়া আছে; এখন সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে; এই সময় আত্মানন্দ

আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একখানি আসন লইয়া সুশীলার সম্মুখে বসিল। প্রথমে নানা কথা হইল; তাহার পর আত্মানন্দ বলিল "সুশীলা তুমি ত সুস্থ হইয়াছ; এখন তুমি কি করিবে বল ত?"

সুশীলা বলিল "আমি স্বামীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই আশ্রমেই থাকিব।"

আত্মানন্দ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "এ অভিপ্রায় কি তুমি নিজেই করিয়াছ, না আর কেহ তোমাকে এই পরামর্শ দিয়াছে?"

সুশীলা বলিল "স্বামীজিই আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন।"

আত্মানন্দ চুপে চুপে বলিল "সুশীলা, আমি আজ এক মাসের উপর তোমার সেবা করিতেছি; তোমার প্রাণরক্ষার জন্য দিনরাত কাটাইয়াছি। তুমি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবে? আমি তোমাকে কোন কুপরামর্শ দিতেছি না; তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি, তুমি এ আশ্রমে থাকিও না। এ স্থান ভাল নহে।"

সুশীলা বলিল "এ স্থান ভাল নহে, এ তুমি কি কথা

বলিতেছ ? এ স্থান যদি ভাল না হয়, তা হ'লে তুমি এমন ভাল লোক, তুমি এখানে রয়েছ কেন, বাবাজি !"

আত্মানন্দ বলিল "আমার কথা, আর তোমার কথা স্বতন্ত্র ; বিশেষ আমি এতদিন কিছুই জান্‌তাম না। দিনরাত সুধু পড়া নিয়েই থাক্‌তাম। কে কি কর্‌ছে, না কর্‌ছে, তা দেখ্‌বার বা অনুসন্ধান করবার আমার সময়ও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু এখন আমি এ আশ্রমের অনেক কথা জান্‌তে পেরেছি। তুমি যদি এমন অসুস্থ হ'য়ে আশ্রমে না আস্‌তে, তা হ'লে আমি কোন্ দিন এখান থেকে চলে যেতাম।"

সুশীলা বলিল "শুনেছি বাবাজি, তুমি এখানে সাত আট বৎসর রয়েছ ; ইহার মধ্যে তোমার মনে কোন সন্দেহ হ'ল না, বা তুমি কিছু জান্‌তে পারলে না।"

আত্মানন্দ বলিল "বলেছি ত, আমি আর কিছুতেই মন দিতাম না। এখন যা জান্‌তে পেরেছি, তা আমি প্রকাশ করতাম না, গুরুনিন্দাও করতাম না ; চুপ ক'রে এই আশ্রম ছেড়ে চ'লে যেতাম। কিন্তু এখন ত আর তা হয় না। আজ একমাসের উপর তোমার সেবা কর্‌লাম ; তোমাকে সুস্থ করলাম। এখন যে তোমাকে এখানে ফেলে আমি যাব,

আর তুমি স্বামীজির কুহকে প'ড়ে তোমার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেবে, এ আমি কেমন ক'রে সহ্য করব ? তাই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ব'লে মনে হ'ল।"

সুশীলা বলিল "বাবাজি, তোমার কথা ত আমি বুঝ্তে পার্ছি না। যে স্বামীজি আমাকে গঙ্গার গর্ভ থেকে বাঁচিয়েছেন, যিনি এতদিন আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন, যিনি আমাকে কন্যার মত দেখেন, যিনি আমাকে ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে এই আশ্রমেই থাকৃতে আদেশ করেছেন, তাঁর যে কোন কু-মতলব আছে, তা ত তাঁর ব্যবহারে আমি মোটেই বুঝতে পারি নাই।"

আত্মানন্দ একটু হাসিয়া বলিল "তা বুঝতে তোমার অনেক বিলম্ব আছে সুশীলা! আমাদের এই সন্ন্যাসীদলের মধ্যে কত চোর, কত অসাধু, কত লম্পট যে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে আছে, তা তুমি কি ক'রে জান্‌বে। আর যাঁরা এখন খুব নামজাদা সন্ন্যাসী ; যাঁর স্বামী, পরমহংস, সরস্বতী প্রভৃতি নাম জাহির ক'রে দশজনের উপর প্রভুত্ব করছেন, বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করছেন ; পরম সাধু, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র-চরিত্র মহাত্মা ব'লে যাঁরা খ্যাতিলাভ ক'রেছেন ; এই কাশীতেই তাঁদের

মধ্যে কতজন যে গোপনে কত লীলা ক'রে থাকেন, তা কি সহজে কেউ ধর্‌তে পারে। আমাদের আশ্রমটাও তাই। তুমি একটি কথা বেশ জেনে রেখো যে, যে বাহিরে খুব জাঁক-জমক করে, খুব ধর্ম্মের ভাব দেখায়, তার ভিতরে অনেক গলদ্; সেই গলদ্ ঢেকে রাখ্‌বার জন্যই সে ব্যস্ত হ'য়ে এই সব বাহ্যাড়ম্বর করে। তা দেখে তুমি ভুলো না, সুশীলা!"

সুশীলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তা হলে তুমি আমাকে কি কর্‌তে বল বাবাজি!"

আত্মানন্দ বলিল "তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। তোমার সম্বন্ধে স্বামীজি যে মতলব ক'রেছেন, তা তোমার কাছে ব'লে আমি আমার জিহ্বা কলুষিত কর্‌তে চাই না। এইটুকু জেনে রাখ যে, তোমার সম্মুখে ঘোর বিপদ্। তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানি না; তবে স্বামীজির মুখে শুনেছি যে, তুমি অনেক বিপদ কাটিয়েছ, তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ। কিন্তু সে সকল বিপদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছ; কারণ তুমি যাদের হাতে পড়েছিলে তারা আমাদের মত সন্ন্যাসী নয়; তারা আমাদের মত গৈরিক-ভস্ম-ত্রিপুণ্ডক-

দীর্ঘ-জটাভার দিয়ে তাদের কুপ্রবৃত্তি, কুমতলব ঢেকে রাখ্‌তে অভ্যস্ত নয়। তুমি বদ্‌মায়েসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছ, কিন্তু সাধুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। তারা এমন ক'রে ধর্ম্মের কথা ব'লে তোমাকে ভুলিয়ে নেবে যে, তোমার সাধ্যও থাকৃবে না যে, তুমি তাদের হাত থেকে এড়িয়ে যাও। এই দেখ না, তুমি যে স্বামীজিকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা কর্‌ছ; এর মানে কি? অর্থাৎ তিনি তোমাকে বেশ ভুলিয়ে ফেলেছেন। এর পর তোমার সর্ব্বনাশ করতে তাঁর আর কোন বেগ পেতে হবে না। তাই বল্‌ছিলাম যে, যদি ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে চাও, তা হলে এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাও।''

সুশীলা কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "কোথায় যাব?"

আত্মানন্দ বলিল "তুমি যদি যেতে চাও, আমিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে ভাল স্থানে নিয়ে যেতে পারি।"

সুশীলা বলিল "তুমিও ত সন্ন্যাসী! স্বামীজিকে তুমি যে অপরাধে অপরাধী কর্‌ছ, তুমি যে তা নও, তার প্রমাণ কি? তিনি যদি এখানে আমার সর্ব্বনাশের অভিপ্রায় ক'রে থাকেন,

তা হলে তুমি যে আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পরে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করবে না, তাই বা কে জানে? না, না, তুমি আমাকে ও সব কথা ব'লো না। তোমার কথা শুনে স্বামীজির উপর ত আমার অশ্রদ্ধা হয় নাই; কিন্তু তুমি যে আমার এত করেছ, আমাকে এক-রকম মরার ঘর থেকে ফিরিয়ে এনেছ, তোমার উপরই আমার অভক্তি হচ্চে; শুধু অভক্তিই বা বলি কেন, তোমার উপর আমার সন্দেহই হচ্চে। মাপ কোরো বাবাজি, অনেক বিপদে ঠেকে এখন আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না—সকলকেই সন্দেহ করি। তুমি তোমার কাজে যাও; আমার সঙ্গে ও বিষয় নিয়ে আর আলোচনা কোরো না। আমি এখানেই থাকব, তাতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। সে জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। আমি মানুষের সাহায্য আর চাই না, সে বিষয়ে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।"

আত্মানন্দ বলিল "বেশ, তাই হোক্। আমি আমার কর্ত্তব্য করলাম; এখন আমার কথামত চলা না চলা তোমার ইচ্ছা। আজ তোমাকে এত কথা বলছি কেন, তার কারণ

আছে। আমি আর এখানে থাক্‌ব না; কা'লই এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাব। এতদিন আমি চলিয়া যাইতাম, সুধু তোমাকে সুস্থ কর্‌বার জন্য আমি এখানে ছিলাম। স্বামীজি আমার মন্ত্র-গুরু নন, তিনি আমার শিক্ষাগুরু; আমি তাঁর কাছে বেদান্ত পড়্‌তে এসেছিলাম; কিন্তু তাঁর যে প্রকার চরিত্র কিছুদিন হ'তে জান্‌তে পেরেছি, তাতে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেবার আমার প্রবৃত্তি নেই। আজ একমাসের উপর—এই যতদিন তুমি এসেছ—তাঁর কাছে পাঠ নিই নাই—আর নেবও না। তোমাকে একটি কথা ব'লে যাই। আমি কাশী ত্যাগ করে যাচ্ছি; এখানে আর থাক্‌ব না। আমি হরিদ্বারে আমার গুরুজির কাছে যাব। দেখ, তুমি আমাকে সন্দেহ কর্‌ছ, তাতে আমার কষ্ট হচ্চে না, কারণ তুমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছ; কিন্তু তবুও ব'লে যাই, যদি কোন বিপদে পড়, তা হলে জয়পুর-ছত্রে গিয়ে হরিহরানন্দ ব্রহ্মচারীর খোজ কোরো। তিনি তোমাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দেবেন; সেখানে আমার গুরুর আশ্রমে তুমি পরম শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বে।" এই বলিয়াই সুশীলার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আত্মানন্দ সে স্থান ত্যাগ করিল।

সুশীলা বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার অন্ত নাই।

*　　　*　　　*　　　*

আত্মানন্দ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক। সে চলিয়া গেলে, কি জানি কেন, সুশীলার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; আত্মানন্দের কথা তাহার নিকট প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহাকে অধিক দিনও অপেক্ষা করিতে হইল না। আত্মানন্দ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সাতদিন পরেই সে তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আত্মানন্দ চলিয়া গিয়াছে।

সুশীলা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে; তাহার শরীরও ভাল হইয়াছে। সে একাকিনী আশ্রমের এক নির্জ্জন কুটীরে বাস করে। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর সে তাহার কুটীরের দাবায় বসিয়া আছে, এমন সময় স্বামীজি সেখানে আসিলেন। সুশীলা তাঁহাকে দেখিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিয়া নিজে মৃত্তিকাসনে বসিল।

স্বামীজি প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বের মত সুশীলার কুশল

জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর বলিলেন "সুশীলা, তুমি কবে আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে?"

সুশীলা বলিল "আমি ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।"

স্বামীজি বলিলেন "মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ! কাহার নিকট?"

সুশীলা বলিল, "বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং আমাকে মন্ত্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহারই দেওয়া মন্ত্র জপ করি; অন্য মন্ত্রে ত আমার প্রয়োজন নাই।"

স্বামীজি বলিলেন "আরে, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। ওর নাম মন্ত্রগ্রহণ বলে না! সাধু-সন্ন্যাসীকে গুরুপদে বরণ ক'রে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিতে হয়, তবে ত সাধনা সফল হয়।"

সুশীলা বলিল "মন্ত্র না হয় গ্রহণ করলাম; তার পর কি কি অনুষ্ঠান করতে হবে, তা আগে শুনি। তা হলে বল্‌তে পারব, আমি মন্ত্রগ্রহণের উপযুক্ত হয়েছি কি না।"

স্বামীজি অম্লানবদনে বলিলেন "তুমি জান না সুশীলা, স্ত্রীলোকেরা একাকিনী সাধনপথে চলিতে পারে না; একজন সাধু-পুরুষের আশ্রয় নিয়ে তাকে এ পথে অগ্রসর হ'তে হয়!"

সুশীলা বলিল "আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

স্বামীজি বলিলেন "এ পথে চল্‌তে হ'লে একজন পুরুষকে —একজন সাধুকে স্বামীপদে বরণ ক'রে নিতে হয়।"

সুশীলা বসিয়া ছিল; এই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল "তা হলে আত্মানন্দ বাবাজি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক!"

স্বামীজি বলিলেন "সে কি বলেছিল?"

সুশীলা তখন ক্রোধে অধীরা হইয়া উঠিয়াছিল; কি যে উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না; তাহার অজ্ঞাতসারেই যেন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "সে বলিয়াছিল, তুমি ঘোর নারকী, তুমি লম্পট্, তুমি ভণ্ড সাধু, তুমি কুকুরেরও অধম; তুমি—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে স্বামীজি বলিলেন, "সাবধান! তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ জানিস্।"

"হাঁ জানি, আমি সাধু-বেশধারী এক মহা লম্পটের সহিত কথা বল্‌ছি। শোন ঠাকুর, তুমি যদি আর এক-পা এগিয়ে এস, তা'হলে তোমাকে—।" সুশীলা আর বলিতে পারিল না, ক্রোধে তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল; সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। স্বামীজিও একে-

বারে কেমন হইয়া গেলেন; তাঁহার সাধ্য হইল না যে, আসন ত্যাগ করিয়া সুশীলাকে আক্রমণ করেন, বা তাহাকে কিছু বলেন। তিনি সুশীলার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

একটু পরেই আত্ম-সংবরণ করিয়া সুশীলা বলিল, "শোন সন্ন্যাসী, এই আমি তোমার আশ্রম ত্যাগ ক'রে চল্‌লাম। তোমার সাধ্য থাকে, আমাকে আট্‌কাও।" এই বলিয়া সুশীলা সেই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গেল। স্বামীজি তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন!

সুশীলা আশ্রম হইতে বাহির হইয়াই কেমন যেন বোধ করিতে লাগিল। যে শক্তি তাহাকে আশ্রমের বাহিরে লইয়া আসিয়াছিল, সে শক্তি, সে তেজ যেন কমিয়া যাইতে লাগিল। রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া এতটুকু পথও সে হাঁটে নাই। তাহার পর এই উত্তেজনা—তাহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। সে চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিল; তাহার পরই "মাগো —মা" বলিয়া সে পথিপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তিনদিন পরে যখন তাহার প্রথম জ্ঞান-সঞ্চার হইল, তখন সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল; দেখিল তাহার পার্শ্বে কে

যেন বসিয়া আছে। সে প্রথমে চিনিতে পারিল না ; ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। একটু পরেই আবার চাহিল ; এবার সে চিনিতে পারিল—এ যে তিনকড়ির বড়দিদি। সে তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "বড়-মাসিমা !" তাহার পরেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

[২৯]

তিনকড়ি ও তাহার বড়দিদি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সুশীলার পলায়নের পর হইতেই তিনকড়ির স্বভাব একবারে বদল হইয়া গিয়াছিল; সে বাড়ী হইতে কন্সার্টের পার্টি তুলিয়া দিয়াছিল। যাহারা সে সময়ে তাহার ইয়ার-বন্ধু ছিল, তিনকড়ি তাহাদিগের সহিত মেলামেশা দূরে থাকুক, বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিত না। বড়দিদি তাহার এই ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

হরিশ ঘোশ তিনকড়ির জন্য পনরটাকা বেতনের একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনকড়ি সে কাজ স্বীকার করে নাই। সে তাহার বড়দিদির সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে দুইশত টাকা লইয়া চিৎপুর রোডের উপর একটা 'ষ্টেসনারী' দোকান খুলিল। যেখানে যে জিনিষ সস্তা পাওয়া যায়, তাহা কিনিয়া আনিয়া সে বিক্রয় আরম্ভ করিল; তাহার দোকান হইতে কেহই, এমন কি তাহার পরম বন্ধুও, ধারে কোন জিনিস লইতে পারিত না। সে একই কথা বলিত "ধার দিতে হয় বাড়ীতে

দেব; দোকানে ব্যবসা কর্‌তে এসেছি; এখানে ধারে কাজ কর্‌ব না।”

ক্রমে তাহার দোকানের যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল। দোকানে যেদিন যত টাকা বিক্রয় হইত, তাহা হিসাব করিয়া আনিয়া সে তাহার বড়দিদির হাতে দিত; বড়দিদির পরামর্শ ব্যতীত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, সে একটি পয়সাও খরচ করিত না।

বড়দিদির বড়ই ইচ্ছা যে, তিনকড়ির বিবাহ দেন; কিন্তু তিনকড়ি বিবাহ করিতে মোটেই সম্মত নহে। বিবাহের কথা উঠিলেই সে বলে “না, না, বড়দিদি, ও কথাই তুলো না। আমি এ জন্মে বিবাহ করিব না—কিছুতেই না। আমার উপর ভগবানের অভিশাপ। জান না বড়দিদি, আমারই বুদ্ধির দোষে, আমারই অপরাধে স্থশীলা এমন ক’রে ভেসে গিয়েছে। তার কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি? আমি যখনই একটু সময় পাই, তখনই স্থশীলার কথাই আমার মনে হয়। আমি যদি তাকে সাবধান কর্‌তুম্, আমি যদি বাড়ীতে সব বদ ছোক্‌রাদের আড্ডা না বসাতুম, তা’হলে কি স্থশীলা এমন কাজ করতে পারত। না দিদি, বিবাহের কথা বোলো না, সে আমি পারব

না। যদি কোন দিন সুশীলার কথা ভুলতে পারি, যদি কোন দিন আমার অপরাধের কথা ভুলতে পারি, তবে সে দিন বিবাহ করব, ঘরসংসার করব; তা নইলে আর কিছুদিন পরে তুই ভাইবোনে কাশী গিয়ে বাস কর্‌ব।" এই রকম কথা শুনিয়া বড়দিদি আর কোন কথা বলিতেন না; তিনকড়ির হৃদয় যে কত উচ্চ, তাহা ভাবিয়া বড়দিদি অতুল আনন্দ বোধ করিতেন।

এইভাবে এক বৎসরের উপর চলিয়া গেলে একদিন বড়-দিদি তিনকড়িকে বলিলেন "তিনকড়ি, আমার বড় ইচ্ছা যে একবার তীর্থ ক'রে আসি। এতদিন ত তোমাকে বল্‌তে পারি নাই; এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মা-কালীর কৃপায় তুমি দুপয়সা উপার্জ্জন কর্‌ছ; এখন আমি একবার তীর্থভ্রমণে যেতে চাই। তুমি কি বল?"

তিনকড়ি বলিল "বড়দিদি, আমি কি আর সে কথা ভাবিনি। তোমার জন্য ত কিছুই করতে পার্‌লাম না; যদি তীর্থ করিয়ে আন্‌তে পারি, তা হলেও মনে জান্‌ব যে, দিদির জন্য কিছু একটু করলাম। কিন্তু কথাটা কি জান? তোমাকে আমি কিছুতেই একেলা কোথাও পাঠাতে পার্‌ব না। আর তুমি

চ'লে গেলে আমার দিকে চাইবার কে থাক্‌বে? আমি যে কাজকর্ম্ম করি, আমি যে ভালভাবে থাকি, এ সবই তোমার জোরে; তুমি না থাক্‌লে বড়দিদি, আমি কোন্ দিন ভেসে যেতাম। তা সে কথা থাক্; তুমি আর মাসখানেক অপেক্ষা কর। আমি অনেকদিন থেকেই দোকানের কাজে আমার সাহায্য করবার জন্য একটা লোক খুঁজছি। একটা ভাল লোকের সন্ধানও পেয়েছি। তাকে যদি ঠিক করতে পারি, তা হলে তার উপর দোকানের ভার দিয়ে আমরা দু ভাইবোনে মাস-দুয়ের জন্য তীর্থে বেরুব। তুমি আর মাসখানেক সবুর কর।"

একমাস পরেই একটা বিশ্বাসী লোকের উপর দোকানের ভার দিয়া তিনকড়ি বড়দিদিকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ ও গয়া হইয়া তাহারা কাশীতে পৌঁছিয়াছিল।

তাহারা যে দিন কাশীতে গিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ি ও বড়দিদি বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিবার পর একটু সহর ঘুরিয়া বাসায় আসিতেছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের পার্শ্বে একটি লোককে অন্ধকারের মধ্যে পতিত

দেখিতে পাইল। তিনকড়ি সেই লোকটির নিকটে যাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল "বড়দিদি, এ একটা মেয়েমানুষ।"

বড়দিদি বলিলেন "গায়ে হাত দিয়ে দেখ্ ত, গিয়েছে, না বেঁচে আছে।"

তিনকড়ি রমণীর গায়ে হাত দিয়া বলিল "না বড়দিদি, মরে নাই; গা গরম আছে। বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে।"

বড়দিদি বলিলেন "অন্ধকারে ত কিছু বুঝতে পারছিনে। তিনকড়ি, তোর পকেটে দিয়াসলাই থাকে ত জ্বাল্; দেখি মেয়েটার কি হয়েছে।"

তিনকড়ি পকেট হইতে দিয়াসলাই বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোকটির মুখের কাছে লইয়া যাইয়াই চীৎকার করিয়া কাঠিটা ফেলিয়া দিল; তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; সে যেন কেমন হইয়া গেল।

তাহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বড়দিদি বলিলেন "কি রে তিনু, কি? তুই অমন করছিস্ কেন? কি হয়েছে?"

তিনকড়ি তখন একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল "দিদি, এ যে আমাদের সুশীলা!"

"সুশীলা! আমাদের সুশীলা! তুই কি বলিস্ তিনু!" এই বলিয়া বড়দিদি সেই মূর্চ্ছিতা রমণীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ একটা দিয়াসলাই ধরাইয়া স্ত্রীলোকটির মুখের কাছে লইয়া গেল। বড়দিদি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন "সত্যই ত, এই ত আমাদের সুশীলা!" এই বলিয়াই তিনি সুশীলার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "তিনু, শিগ্গির দেখ্, একখানা গাড়ী পাওয়া যায় কি না; যত ভাড়া লাগে তাই দেব, শিগ্গির গাড়ী দেখ্। আর দেখ্ ত ভাই, কাছে জল পাস্ কি না।"

সুশীলার সেই সময় একবার জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল এবং পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া উভয়েরই মনে আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলিল "দিদি, আর জলটল এখন কাজ নেই, আমি আগে গাড়ী দেখি। গাড়ী ক'রে ওকে বাসায় নিয়ে যাই; তারপর দেখা যাবে।" এই বলিয়া সে রাস্তা দিয়া দৌড়িল।

একটু যাইতেই সে দেখিল, একখানি গাড়ী আসিতেছে।

সে তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীখানি ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে। তিনকড়ি বলিল "দুর্গাবাড়ির কাছে। যা ভাড়া চাস্, তাই মিলেগা।"

এই বলিয়া সে এবং বড়দিদি দুইজনে ধরাধরি করিয়া সুশীলাকে গাড়ীর মধ্যে তুলিল। সুশীলা তখনও অজ্ঞান।

একটু পরেই গাড়ীখানি দুর্গাবাড়ির নিকট উপস্থিত হইল। তিনকড়ি গাড়ায়ানের ভাড়া দিয়া, বড়দিদির সাহায্যে সুশীলাকে নামাইল এবং দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের বাসায় লইয়া গিয়া একটা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বড়দিদি তখন সুশীলার মুখেচোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন। একটু পরেই সুশীলার জ্ঞানসঞ্চার হইল। সে বড়দিদির দিকে চাহিয়া অতি কাতরকণ্ঠে বলিল "মাসিমা।"—তাহার পরই পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি ও বড়দিদি যে বাড়ীতে ছিলেন, সে বাড়ীতে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণও ছিলেন। তিনি ও তাঁহার বিধবা ভগিনী কাশীবাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় এক বৎসর এই বাড়ীতে আছেন; সুতরাং তাঁহারা কাশীর অবস্থা সমস্তই জানেন। তিনকড়ি সেই ব্রাহ্মণকে তাহাদের উপস্থিত

বিপদের কথা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন "ভয় কি, আমার সঙ্গে তুমি এস; নিকটেই একজন ভাল ডাক্তারের বাসা আছে। তাঁকে ডেকে আনি। তিনি বড় দয়ালু লোক; তোমাদের অবস্থার কথা শুন্‌লে তিনি ভিজিট ত নেবেনই না, আরও হয় ত ঔষধও অমনিই দিবেন।"

তিনকড়ি বলিল "না, না, আমরা তাঁকে ভিজিট দিতে পারব, ঔষধের দামও দিতে পারব; সে সাহায্য আমরা চাই না।" এই বলিয়া সে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের সহিত ডাক্তারের বাড়ীতে গেল; এবং অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া বাসায় আসিল। ডাক্তার বাবু রোগিনীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হচ্চে, ইনি অত অল্পদিন হইল কোন কঠিন রোগ থেকে উঠেছেন; শরীর এখনও ভাল হয় নাই। হঠাৎ বিশেষ উত্তেজনা হওয়ায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন। এঁর কি হয়েছিল, বল্‌তে পারেন?"

তিনকড়ি বলিল "ইনি আমার বোনের মেয়ে; কাশীতেই বাস কর্‌ছিলেন। এঁর যে কোন অসুখ হয়েছিল, সে খবর আমরা জানিনে; আমরা সবে আজ এখানে এসেছি। একটু আগে রাস্তা দিয়ে আস্‌বার সময় পথের ধারে ইনি অচৈতন্য অব-

স্থায় পড়ে আছেন, দেখ্‌তে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি, ইনি আমার বোনের মেয়ে। তখন তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে এখানে এসেই আপনার কাছে ছুটে গিয়েছি। পূর্ব্বে কি হয়েছিল, না হয়েছিল, তা আমরা ত কিছুই ব'লতে পারব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "যাক্, তার জন্য চিন্তা নেই; এখন ওঁর জ্ঞানসঞ্চার করাতে হচ্চে।" এই বলিয়া তিনি ঔষধ লিখিয়া দিলেন এবং যাইবার সময় বলিলেন "আপনারা ভয় করবেন না; এঁর জীবনের আশঙ্কা নেই; তবে মূর্চ্ছা কেটে যেতে হয় ত সারারাত লাগ্‌বে। আমি যে ঔষধ লিখে দিয়ে গেলাম, এইটা এখনই এনে নিয়মমত খাওয়াবেন। তারপর কেমন থাকেন, সেই সংবাদটা কাল খুব সকালে আমাকে দেবেন। আমি তখন এসে যা হয় করব।"

সে রাত্রি গেল; তাহার পরের দিনরাত্রি গেল; ডাক্তার বাবু নানা ঔষধ দিতে লাগিলেন; নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই সুশীলার চেতনাসঞ্চার হইল না। ক্রমাগত দুইদিন তিনকড়ি ও বড়দিদি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সুশীলার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন; যে যাহা বলিল, তাহাই করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল

না। তৃতীয়দিন প্রাতঃকালে সুশীলার চেতনাসঞ্চার হইল; সে ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিল। বড়দিদি তখন তাহার কাছেই বসিয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন "সুশীলা, মা, কেমন আছ?" সুশীলা কথা বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কেবল ওষ্ঠদ্বয় নড়িল। বড়দিদি বলিলেন "সুশীলা, মা!" সেই সময় তিনকড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল, সুশীলা চক্ষু মেলিয়াছে। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল "দিদি, ঐ দেখ, সুশীলা চোক চেয়েছে। ও সুশীলা, সুশীলা, আমাদের চিন্‌তে পারছ।" বড়দিদি বলিলেন "তিনকড়ি, চুপ কর্। এখন ওকে কথা বল্‌তে দিয়ে কাজ নেই; আবার হয় ত অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে।"

সুশীলা তখন অতি ধীরে বলিল "মাসীমা—তুমি!"

বড়দিদি বলিলেন "হ্যাঁ-মা, আমি; আমি তোমার বড়মাসী-মা। ও মা, দেখ্‌তে পাচ্ছ; তোমার তিনকড়ি-মামা তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।"

সুশীলা তিনকড়ির দিকে চাহিল; কি যেন বলিতে গেল; কিন্তু বলিতে পারিল না, চক্ষু মুদিত করিল। একটু পরেই আবার চক্ষু চাহিয়া বলিল "তিনকড়ি-মামা, তোমরা কি ক'রে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া তিনকড়ি বলিল "এখন বেশী কথা বোলো না। তুমি সুস্থ হও, তখন সব কথা শুনো। এখন তুমি বড় দুর্ব্বল ; ডাক্তার তোমাকে কথা বল্‌তে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন। তুমি একটু ঘুমোও।"

সুশীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

[৩০]

দীনেশের কারামুক্তির দিন নিকট হইল। সতীশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল; তিন চারি দিনের মামলা-মোকদ্দমার ভার অপর একজন উকিলের হস্তে সমর্পণ করিয়া, সে কলিকাতায় যাত্রা করিল; এবং দীনেশ যে দিন প্রাতঃকালে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার পূর্ব্বদিন সতীশ কলিকাতায় উপস্থিত হইল। সুশীলার মাতাকে সাজাহানপুর লইয়া যাইবার পর সতীশ আর কলিকাতায় যায় নাই। কলিকাতায় যাইয়া এবার আর সতীশ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের বাসায় উঠিল না; সে যে কলিকাতায় যাইতেছে, এ সংবাদও সে কলিকাতায় কাহাকেও জানায় নাই; কারণ তাহা হইলে দীনেশকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া বাসাতেই লইয়া যাইতে হইত। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ছিল না। দীনেশের সহিত গ্রামের কাহারও সাক্ষাৎ হয়, ইহা সতীশের ইচ্ছা ছিল না। তাই সে কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিয়ালদহের হিন্দু-আশ্রমে টেলিগ্রাফ করিয়া সেখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই সতীশ তাড়াতাড়ি একখানি

গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রেসিডেন্সি-জেলের সম্মুখে গেল। সে ইতি-পূর্ব্বেই সংবাদ লইয়াছিল যে, দীনেশ প্রেসিডেন্সি জেলেই আছে এবং ঐ দিন প্রাতঃকালে সাতটার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সতীশ গাড়ী হইতে নামিয়া জেলের গেটের নিকট একটি বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সাতটা বাজিবার অব্যবহিত পরেই দীনেশকে জেলের বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

দীনেশ বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আজ আঠারো মাস পরে সে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। সে গেট হইতে একটু অগ্রসর হইবামাত্র সতীশ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। দীনেশের তখন আর কথা বলিবার শক্তি থাকিল না; সে সতীশকে বুকে মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল সতীশেরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না।

দুইতিন মিনিট এই ভাবেই গেল—কাহারও মুখে ক নাই; তখন কথা বলিবার অবস্থাও কাহারও ছিল না। দেশে ভাই ভাইয়ের সংবাদ লয় না,—বিপদে মুখের দিকে চ না, সে দেশে এমন বন্ধুপ্রীতির দৃশ্য দেখিবার মতই বটে। দি

কলিকাতায় গড়েরমাঠের এক প্রান্তে কারাগারের সম্মুখে, বৃক্ষতলের এ দৃশ্য আর কেহ দেখিল কি না জানি না,—একজন তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন! তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি এ দৃশ্যের উপর পতিত হইয়াছিল—তাঁহার শুভ-আশীর্ব্বাদ এই দুইটি মানবের উপর নিশ্চয়ই বর্ষিত হইয়াছিল।

সতীশ ও দীনেশ হয় ত এই ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ থাকিত; কিন্তু গাড়ীর কোচম্যানের তাগিদে তাহাদের হুঁস হইল। তখন সতীশ বলিল "আর এখানে কেন? চল, যাওয়া যাক্।"

দীনেশ বলিল "সতীশ, তুমি কখন কলকাতায় এসেছ?"

সতীশ বলিল "আমি কা'ল এখানে এসেছি। আজই তোমাকে নিয়ে সাজাহানপুর রওনা হব।"

দীনেশ বলিল "এখন তা হ'লে আমরা কোথায় যাব?"

সতীশ বলিল "আমি কা'ল এসে আমাদের বাসায় উঠিনি; মনে হইল আমাদের বাসায় যেতে তুমি হয় ত সঙ্কোচবোধ করতে পার। তাই আমি শিয়ালদহের হিন্দু-আশ্রমে আছি। চল, এখন সেখানেই যাই; তার পর রাত্রির মেল-গাড়ীতে যাওয়া যাবে।"

দীনেশ আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ীতে উঠিল; সতীশও তাহার পার্শ্বে বসিল। গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ীর সব ভাল ত? সুশীলা কেমন আছে?"

সতীশ এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করিতেছিল; সে একটুও দ্বিধা না করিয়া বলিল "সুশীলা ভালই আছে, আমার বাসারও সকলেই ভাল আছে; তোমার স্ত্রীর শরীরও একরকম আছে।"

দীনেশ বলিল "ভাই সতীশ, তোমার কাছে কি ব'লে যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব, ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি যে—।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সতীশ বলিল "ও সব কথা থাক্। এখন বল, তোমার শরীর ত ভাল ছিল। কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করব না; কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করে, এত মনের অসুখে তোমার শরীর ত ভাল ছিল?"

দীনেশ বলিল "না, এই দুই বৎসরের মধ্যে আমার কোনই অসুখ হয় নাই; বিশেষ জেলের অধ্যক্ষ ও ডাক্তারেরা বরাবর আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করেছেন; আমি কোন দিন তাঁদের কাছে থেকে কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহার পাই

নাই। আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে, হয় ত, তোমার হাত ছিল।"

সতীশ বলিল "না, তুমি যে মনে করছ আমি ঘুষ দিয়ে কিছু করেছি, তা নয়; তবে আমার একটী বন্ধু পাটনা-জেলে বড় কাজ করেন; তাঁকে দিয়ে একটু সুপারিস্ করিয়ে-দিলাম; কিন্তু তারই জন্য যে জেলের কর্ম্মচারীরা তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন, তা আমার মনে হয় না। তুমি জেলের মধ্যে খুব ভালভাবে ছিলে, তাই তাঁরা তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। আর আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে সব অত্যাচার, সে সব ঘুসঘাসের কথা জেলের সম্বন্ধে শোনা যেত, এখন আর সে সব নেই; এখন জেলেই বল, আর পুলিসেই বল, অনেক ভাল লোক, অনেক শিক্ষিত লোক প্রবেশ করেছেন। তাঁদের কাছে থেকে অন্যায় বা অসদ্ব্যবহার প্রত্যা-শাই করা যেতে পারে না।"

এই প্রকার নানা বিষয়ের কথা হইতে হইতে তাহারা শিয়ালদহের হিন্দু-আশ্রমে উপস্থিত হইল। সতীশ এতক্ষণ এমন সকল বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেছিল যে, দীনেশ তাহার কন্যার সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ না

পায়। মিথ্যাকথা বলা যে কত শক্ত ব্যাপার, সতীশ তাহা বুঝিতেছিল। একটা মিথ্যা কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ইহার পর দীনেশের জেরায় বা অন্য কথায় তাহার সে মিথ্যা-কথাটা ধরা না পড়ে, তাহারই জন্য সে সতর্ক হইয়াছিল। তাহার স্রধুই মনে হইতেছিল, কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া দীনেশকে সাজাহানপুরে লইয়া যাইতে পারিলেই সে বাঁচে। সেখানে গেলে যাহা হয়, তাহার ব্যবস্থা তখন করা যাইবে।

হিন্দু-আশ্রমে স্নান-আহার শেষ করিয়া সতীশ বলিল "ভাই দীনেশ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? একবার আমাকে বেরুতে হবে। আমি কল্‌কাতায় আস্‌ছি খবর পেয়ে আমার মেয়ে কানপুর থেকে কয়েকটা ফরমাইস পাঠিয়েছে। আমার জামাই যে এখন কানপুরের এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন ডাক্তার। তার সে জিনিসগুলো কিন্‌তে হবে; বাড়ীরও কিছু বরাত আছে, সেগুলোও নিয়ে যেতে হবে।"

দীনেশ বলিল "সুশীলা কিছু নিয়ে যেতে বলে নাই?"

সতীশ উকিল মানুষ। ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাহার নামডাকও খুব বেশী। প্রতিদিন তাহাকে ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যা লইয়া কারবার করিতে হয়। কিন্তু সে সকলই পরের বেলায়;

—নিজের বেলায় মিথ্যা কথা বলিতে সে অভ্যস্ত নয়। ডাক্তারেরা রোগীর শরীরে বেশ অস্ত্রচালনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের শরীরে সামান্য একটা ফোড়া হইলে তাহাতে যদি অস্ত্র করিতে হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া যায়। সতীশেরও তাহাই হইল। মক্কেলের, সাক্ষীর কত মিথ্যা-কথা সে প্রতিদিন শুনিয়া আসিতেছে, অনেক সময় বলিয়াও আসিতেছে—কিন্তু দীনেশের প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিবার সময় তাহার মত উকিলের বুকও কাঁপিয়া উঠিল; তাহার যে এমন জেলা-বিখ্যাত উপস্থিতবুদ্ধি, তাহাও যেন সে সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল "এই যে তোমাকে বল্‌লাম, বাড়ীরও কতকগুলি বরাত আছে। তারই মধ্যে সকলেরই ফরমাইস অল্পবিস্তর আছে।"

দীনেশ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল। তাহার মনে ত কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সতীশ যে তাহার কন্যার সম্বন্ধে উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটু কেমন হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন দুইজনে বাজার করিতে বাহির হইল; এবং বড়বাজার, চীনেবাজার, রাধাবাজার, বেণ্টিক ষ্ট্রীট্,

বহুবাজার ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি নানা স্থান ঘুরিয়া নানা দ্রব্য কিনিয়া ফেলিল। চীনেবাজারে যখন সতীশ কতকগুলি উল ও কার্পেট কিনিল, তখন দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল "এগুলি বুঝি তোমার মেয়ের জন্য? সুশীলাও ত উলের কাজ করতে জানে, সে এ সব নিতে বলে নাই?"

সতীশ বলিল "হাঁ, তারও ফরমাইস আছে, তাই ত এত বেশী ক'রে নিচ্ছি।" দীনেশ বলিল "সুশীলাকে আমি নানা-রকম উলের কাজ শিখাইয়াছিলাম। সে তোমার জন্য কিছু বুনে দেয় নাই?"

সতীশ মহা বিপদে পড়িল; সে আর কত মিথ্যা কথা বলিবে! কিছু উপায় নাই। তাহার পায়ে একযোড়া কার্পে-টের জুতা ছিল। তাহার এক মক্কেলের বাড়ী হইতে সে ঐ জুতাযোড়া উপহার পাইয়াছিল। সে এখন সেই জুতা দেখাইয়া বলিল "এই যে আমি তার বোনা জুতাই ত পায়ে দিচ্ছি।"

জুতাযোড়ার দিকে চাহিয়া দীনেশের মুখ প্রফুল্ল হইল। আহা, দুই বৎসর সে সুশীলার কোন চিহ্নই দেখে নাই। সে সতীশের পায়ের জুতার দিকে চাহিয়া মনে বড়ই আনন্দলাভ

করিল ; বলিল "বাঃ, বেশ ত তৈরী করেছে। আচ্ছা সতীশ, সুশীলা কাজকর্ম্ম করে ত? তুমি তাকে বসিয়ে রেখে, আদর দেও না ত?'

যে সকল প্রশ্ন এড়াইবার জন্য সতীশের ইচ্ছা, দীনেশ তাহাই জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু হতভাগ্যের যে ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কেহ নাই! সেই মেয়েকে সে এতদিন দেখে নাই; তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবারও লোক পায় নাই। আজ সতীশকে পাইয়া সে তাহারই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতে চায়। সতীশ বলিল "কাজকর্ম্ম করতে হয় বই কি! সব কাজই করে।"

দীনেশ বলিল "তাকে দিয়ে খাবার-টাবার তৈরি করিয়ে নেও ত? সে ভাই, নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি করতে শিখেছিল।"

সতীশ বলিল "তুমি সাজাহানপুর চল ত; তখন সকলই দেখ্‌তে জান্‌তে পারবে।" কথোপকথনটা অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য, সে বলিল "দীনেশ, ভাই, আর যা যা বাকি থাকল, তা থাক্। বেলা গেল, চল বাসায় যাই।" এই বলিয়া কোচম্যানকে জল্‌দি গাড়ী হাঁকাইতে বলিল।

দীনেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "দেখ সতীশ, আমাকে সাজাহানপুরে নিয়ে গিয়ে বেশীদিন বসিয়ে রাখ্‌তে পারবে না, যা হয় একটা ঠিক ক'রে দিও। আমার ত ইচ্ছা, কাশীতে একটা কিছু কাজকর্ম্ম পেলেই ভাল হয়। নিতান্ত না হয়, তুমি কিছু টাকা দিও, আমি কাশীতে ছোটখাট একখানা দোকানই করব; তার থেকে যা আয় হবে, তার কিছু দিয়ে তিনটি মানুষের খরচ চালিয়ে নেব; আর বাকিটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। কি বল? মেয়েটিকে কোলে নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাশীতেই কাটিয়ে দেব।"

হায় হতভাগ্য! তুমি ত ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত স্থির করিতেছ; কিন্তু তোমার মস্তকে পড়িবার জন্য যে বজ্র উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কিছুই তুমি জান না।

বাজার-হাট শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা হিন্দু-আশ্রমে ফিরিয়া গেল। সেখানে জিনিসপত্র সমস্ত গোছাইয়া লইয়া, আহারান্তে তাহারা যাত্রা করিল! সতীশ পূর্ব্বদিন যখন হাবড়া ষ্টেসনে পৌছে, তখনই পরদিনের মেল-গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি আসন রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছিল। যথাসময়ে ষ্টেসনে পৌছিয়া তাহারা গাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

দীনেশ বলিল "সতীশ, অকারণ এত বেশী ভাড়া দিয়া সেকেণ্ড্-ক্লাসে না গেলেই ত হইত। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের থার্ড্-ক্লাসই ভাল।"

সতীশ একটু হাসিয়া বলিল "ভাই, কিছুদিন আগে যদি তোমার এ জ্ঞান হ'ত, তা হলে কি আর এ সব হয়। তখন তুমি ত টাকাকে টাকাই জ্ঞান করতে না।"

দীনেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তখন যে তোমার মত বন্ধু আমার পাশে ছিল না।"

একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দীনেশের প্রশ্নের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সতীশ বলিল "দেখ, এই যে আমি হাত-পা ছড়িয়ে শোবার ব্যবস্থা করলাম, একেবারে এক-ঘুমে রাত্রি শেষ করব। নূতন যায়গায় এসে, কা'ল রাত্রিতে আমার মোটেই ঘুম হয় নাই।"

দীনেশ বলিল "আমারও তাই; আজ আমি মুক্তি পাব; তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সাজাহানপুরে যাব; সুশীলাকে দেখ্‌ব; এই সব ভাবনাতে আমারও কা'ল রাত্রে মোটেই ঘুম হয় নাই।"

তাহার পর দুজনেই বিছানায় শয়ন করিল। মেলগাড়ী রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

সতীশ কয়েকবার এপাশ ওপাশ করিয়া একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। দীনেশের আর ঘুম আসে না। এমন যে দ্রুতগামী পঞ্জাব-মেল, তাহাও যেন তাহার নিকট মৃদুগামী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এতদিন সে দিন-গণনা করিয়া আসিয়াছে। কত দিন সে তাহার সুশীলাকে দেখে নাই; আজ সে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন সুশীলাকে দেখিতে যাইতেছে, তাহার মুখখানি দেখিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইতে যাইতেছে। গাড়ীখানি উড়িয়া যায় না কেন? তখনই তাহাদিগকে সাজাহানপুর পৌঁছাইয়া দেয় না কেন? দীনেশ অধীর হইয়া পড়িল; একবার সে শয়ন করে, একবার উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে, আবার শয়ন করে! গাড়ী কিন্তু তখনও বর্দ্ধমানে পৌঁছে নাই!

গাড়ী যখন বর্দ্ধমানে পৌঁছিল, তখন সে শুনিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একজন গান করিতেছে। সে তখন জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া গানটি শুনিবার চেষ্টা করিল। গায়ক গায়িতেছে—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,

একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

এই যে সব আমার আমার, সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে;
হ'লে সব খেলা-সাঙ্গ সোণার অঙ্গ
ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
ওরে ভাই, ক'রে খেলা, গেছে বেলা,
সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি,
তিনিই সবার ভরসা ভবে।"

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িল; গায়ক তখনও গায়িতেছে। গাড়ীর শব্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; গায়কের কণ্ঠস্বর দীনেশ শুনিতে লাগিল, কিন্তু গানের কথাগুলি আর সে শুনিতে পাইল না। সে তখন শয়ন করিয়া গুণ গুণ করিয়া গায়িতে লাগিল—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

ক্রমে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল; ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। হয় ত সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তাহার অভাগী কন্যা সুশীলা তাহার শিয়রে বসিয়া ডাকিতেছে "বাবা!"

[৩১]

সুশীলা এইবার সত্যসত্যই আশ্রয়লাভ করিয়াছে। তিনকড়ি ও বড়দিদি তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য অকাতরে টাকা খরচ করিতেছেন; ডাক্তার যখন যাহা ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই আনিয়া দিতেছেন। বড়দিদি তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা দর্শন করিবেন; কাশীর সমস্ত দেবালয়ে যাইবেন, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবেন; কিন্তু সুশীলাকে পাইয়া তিনি সে সকলই ত্যাগ করিলেন। যে রাত্রিতে সুশীলাকে পাওয়া যায়, সেই সন্ধ্যার সময় তিনি যে একবার বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাহার পর এ কয়দিনের মধ্যে তিনি আর সে মন্দিরে যাইবার অবকাশ পাইলেন না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে অতি তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান করিতে যান বটে, কিন্তু আহ্নিকপূজা করিবার আর সময় পান না। তিনকড়ি একদিন বলিল "বড়দিদি, সুশীলা ত এখন একটু ভালই আছে; তবে আর তুমি পূজাআহ্নিক ছেড়ে দিলে কেন?" বড়দিদি বলিলেন "তিনকড়ি, এই আমার পূজা-আহ্নিক, এর বাড়া পূজা কি আর আছে ভাই! সুশীলার কাছে

আমি যখন ব'সে থাকি, যখন তার মাথায় হাত-বুলিয়ে দিই, যখন তার মুখের কাছে জলের গ্লাস ধরি, তখন আমার মনে হয় আমি মা অন্নপূর্ণার সেবা করছি। তুই ত একদিন কি একখানা বই পড়ে আমাকে শোনাচ্ছিলি যে, নরের সেবা করলেই নারায়ণের সেবা করা হয়। আমি ত সে কথা ভুলিনি।"

তিনকড়ি বলিল "দিদি, যে টাকা এনেছিলাম, তা ত প্রায় ফুরিয়ে এল। এখন হাতে বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা আছে। এ নিয়ে ত আর বেশীদূর যাওয়া হবে না। তুমি যদি বল, তা হ'লে কল্‌কাতায় চিঠি লিখে আর কিছু টাকা আনিয়ে নিই।"

বড়দিদি বলিলেন, 'তিনু, আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। আমি ত মনে করেছি, আমি আর কলকাতায়ও ফিরে যাব না; এখানেই সুশীলাকে নিয়ে থাক্‌ব। তুই কল্‌কাতায় যা। সেখানে গিয়ে একটা বিয়ে-থাওয়া করবার ব্যবস্থা কর। আমি ত এতদিন তোকে মানুষ করলাম; আর আমাকে আট্‌কে রাখিস্‌ কেন ভাই? বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার কর। আমি তাই শুনে, এখানে বাবার নাম করতে করতে ওপারে চ'লে যাই। আরও এক কথা; সুশীলাকে যখন পেয়েছি, তখন

তাকে আমি আর ছেড়ে দেব না; তা সে যতই অন্যায় কাজ করে থাকুক না কেন? সে পথে পড়ে ছিল, হয় ত সেই রাত্রি-তেই মরে যেত। কিন্তু বল্ দেখি, কে আমাদের হাত ধ'রে কাশীতে নিয়ে এল? কে আমাদের সেই রাত্রিতে ঐ পথে নিয়ে গেল? এ সব ভাই সেই বাবার খেলা! সুশীলা পাপ ক'রে থাকে—করেছে; সুশীলা কলঙ্কিনী হয়ে থাকে—হয়েছে। তাতে কি? সে যে মরতে বসেছিল; বাবা যে তাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন, এর মানে কি? এর মানে এই যে, আমরা তাকে ধুয়েমুছে কোলে তুলে নেব। আমি তাই করব ভাই! সুশীলাকে আমি যেমন সেদিন কোলে ক'রে বাসায় এনেছি, তেমনই কোলে ক'রেই তাকে রাখব। সে কুপথে গিয়াছিল, তার জন্য দুঃখ করছি; কিন্তু তাই বলে কি তাকে ফেলে দেব? তুই কি বলিস্?"

তিনকড়ি দিদির মুখের দিকে চাহিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল—এমন কথা বুঝি সে কখনও শুনে নাই! সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল "বড়দিদি, তুমি যা বল্লে সে সব ঠিক; কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমার যে চল্‌বে না। তুমি কি মনে কর যে, তোমার সুমুখে না থাক্‌লে আমি ঠিক

থাক্‌তে পারব। আমি হয় ত আবার বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশে যাব। তখন কি হবে? না দিদি, তুমি আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না। তবে একটা কথা কি জান? আমিও কথাটা আজ কয়দিন থেকেই ভাব্‌ছি! কথাটা কি জান? সুশীলা বেরিয়ে এসেছে; তার যে স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল, তা ত আমার কিছুতেই মনে হয় না। তোমাকে ত একদিন বলেছিলাম যে, ঐ যোগেশ বেটা যা বলেছিল, তা সত্যি নয়। সে নিশ্চয়ই সুশীলার মাথা খেয়েছিল। তারপর তাকে ফেলে পালিয়েছে। সে যে বলে, সে সুশীলাকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করে নাই; সুশীলা কাশীতে এসে তার সঙ্গ ছেড়েছিল; তারপর সে কোথায় চ'লে গিয়েছে, যোগেশ তা জানে না; সুশীলার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নাই;—একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে। ও বেটার অসাধ্য কাজ নাই; ও যে সুশীলাকে অমনই ছেড়ে দিয়েছে, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনে। তারপর ধর, এই একবছরের উপর সুশীলা কি করেছে, না করেছে, তা কিছুই জানিনে। এ অবস্থায় তাকে ত আর কলকাতায় নিয়ে যেতেও পারি না, ঘরেও জায়গা দিতে পারি না। এদিকে তুমি বল্‌ছ যে, তুমি যাকে কোলে তুলে

নিয়েছ, তাকে ফেল্‌তে পারবে না। আমিও যে সে কথাটা না বুঝি, তা নয়। সুশীলাকে যদি আমরা ফেলে যাই, তা হলে সে আবার সেই কুপথেই যাবে। হয় ত আমরা ফেলে না গেলেও সে কুপথেই যাবে; তবু ও আমরা যদি তাকে আশ্রয় দিই, তা হ'লে সে ভালও হ'তে পারে। আমি তাই কিছু ঠিক করতে পারছিনে বড়দিদি! যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তাকে ত আর গৃহস্থের ঘরে স্থান দেওয়া যায় না। কি বল?"

বড়দিদি বলিলেন, "সেইজন্যই ত আমি ওকে নিয়ে এখানেই থাকৃতে চাচ্ছি। আমি ওকে কিছুতেই ফেলে যেতে পারব না। আর আমি বল্‌ছি, সুশীলা হয় ত মোটেই কুপথে যায় নাই।"

তিনকড়ি বলিল, "সুশীলাকে সমস্ত কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার না? তোমার কাছে ও নিশ্চয়ই কিছু গোপন করবে না। আর এক কথা, সুশীলাকে যে পাওয়া গিয়েছে, সে যে অসুস্থ, এ খবর ওর মাকে দিলে হয় না? তিনি কি বলেন, তা জান্‌লে হয় না?"

বড়দিদি বলিলেন "তুই পাগল না কি তিনু! আমি কি তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? তা কি ক'রে হবে?

সে পারব না ভাই! আর ওর মায়ের কথা যা বল্‌ছিলি, আমার যে সে কথা মনে না হ'য়েছিল, তা নয়; কিন্তু তার প্রকৃতি জানি। তুই কি সেই কল্‌কাতার কথা ভুলে গিয়েছিস্‌। আর তারপর আমাদের সঙ্গে তার ত অনেক চিঠি লেখালেখি হয়েছে; কিন্তু একদিনও কোন চিঠিতে সে তার মেয়ের নামটি পর্য্যন্তও করে নাই। সে সুশীলাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না—তার তেমন ভাবই নয়। এ অবস্থায় সুশীলাকে নিয়ে আমাকেই এখানে থাকৃতে হবে।"

তিনকড়ি বলিল "যাক্‌; এখনই ত আর তুমি বাড়ী যাচ্ছ না। সুশীলা সেরে উঠুক; তারপর ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে।"

এই সকল কথার পর তিনকড়ি কোথায় বাহির হইয়া গেল, বড়দিদি সুশীলার নিকট গেলেন। সুশীলা এখনও বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারে না—এত সে দুর্ব্বল! তবে জ্বরটা কমিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন, ভাল রকম সেবা শুশ্রূষা করলে আর আটদশ দিনের মধ্যেই সুশীলা ভাল হয়ে যাবে।

বড়দিদি সুশীলার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা, এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে ত?"

সুশীলা বলিল "মাসিমা, তোমরা আমাকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা, এত টাকা খরচ কেন করছ? আমার বাঁচ-বার দরকার কি? আমাকে তোমরা পথ থেকে কুড়িয়ে কেন নিয়ে এলে? আমি ত মরবার জন্যই পথে এসেছিলাম।"

বড়দিদি বলিলেন "তুমি কি বল্‌ছ সুশীলা! তোমার ভয় কি? আমি যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না।"

সুশীলা বলিল "আমায় তুমি ছেড়ে যাবে না মাসিমা? তিনকড়ি-মামা বল্‌ছিল, তোমরা তীর্থভ্রমণে এসেছ, কাশীতে বাস কর্‌তে এসনি; তা হ'লে আমাকে ছেড়ে যাবে না কি ক'রে?"

বড়দিদি বলিলেন "আমি যেখানে যাব, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। তোমাকে কি আমি আর কাছছাড়া করি।"

সুশীলা কাতরনয়নে বড়দিদির দিকে চাহিয়া বলিল "মাসি-মা, তুমি সত্যিই আমাকে ছেড়ে যাবে না? সত্যি যাবে না? তা হ'লে আমি বাঁচি মাসিমা; নইলে আমি ম'রে যাব মাসিমা, মরে যাব!"

বড়দিদি সুশীলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন

"তুমি এত কাতর হচ্চ কেন মা ? আমি যা বলেছি, তাই কর্‌ব। মনে করেছিলাম, এবার কল্‌কাতায় ফিরে যাব। তারপর তিনকড়ির একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে একেবারে কাশীতে এসে বাস কর্‌ব। বাবা বিশ্বনাথ আমাকে আর যেতে দিলেন না; তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। আর আমি দেশে যাব না।"

সুশীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাসি-মা, আমাকে কি তোমরা ক্ষমা কর্‌বে ? আমি বড় অপরাধ করেছি;—আমি মহাপাপ করেছি; আর তার জন্য মাসি-মা, আমার শাস্তিও কম হয় নেই। আমি খুব শাস্তি পেয়েছি—খুব শাস্তি পেয়েছি। আরও কত শাস্তি পাব, কে জানে ?"

সুশীলা আর কথা বলিতে পারিল না; তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল; চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বড়দিদির প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি সুশীলাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন "ছিঃ, মা, অমন ক'রে কি কাঁদিতে আছে ? যা হবার, তা হ'য়ে গিয়েছে। সে কথা আর কেন মনে করছ ? এখন বাবা বিশ্বেশ্বরের নাম কর; তিনি তোমার সব পাপ দূর করে দেবেন।"

সুশীলা বড়দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "মাসি-মা, আমি ত বিশ্বনাথের নাম ক'রেই এতদিন বেঁচে আছি ; তাঁরই নাম করেই ত এত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি মাসি-মা ! তিনিই ত এই অভাগীর উপর দয়া করে এতদিন পরে— এত কষ্টের, এত যন্ত্রণার পর—" আবার সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল, আবার তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল ।

বড়দিদি নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন "বাবা বিশ্বনাথের নাম কর সুশীলা ! তিনি ত সবই জান্‌ছেন, সবই দেখ্‌ছেন । যত বড় পাপই কর না কেন, তাঁর নাম করলে, সে সব পাপ ধুয়ে যাবে ।"

সুশীলা বলিল "মাসি-মা, পাপ করেছি—মহাপাপ করেছি —তার শাস্তি ত দেখ্‌ছ । কিন্তু তোমায় বলি মাসি-মা,— তোমাকেই বলি । এ জীবনে সে কথা আর কাউকে বল্‌ব ব'লে মনে করি নাই ;—আমার দুঃখের কথা, আমার দুরদৃষ্টের কথা শোনবার যে কেহ আছে, কেহ থাক্‌তে পারে, আমার চক্ষের জল মুছিয়ে দিবার জন্য যে কেহ আস্‌বে—এ কথা ত কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই—স্বপ্নেও ভাবি নাই মাসি-মা ! বাবা বিশ্বনাথ আজ তোমায় এনে দিয়েছেন—তিনিই

তোমাকে আমার কাছে ডেকে এনেছেন। এ অভাগীর উপর তাঁর যে এত দয়া, তা ত জানতাম না মাসি-মা! না, না, মাসি-মা! জান্‌তাম বই কি! জেনেছি বই কি! তিনি প্রাণে বল না দিলে কি আমি এত বিপদ থেকে উদ্ধারলাভ কর্‌তে পারতাম। অন্যায় করেছি বই কি—পাপ করেছি বই কি! তোমাদের ছেড়ে এসে পাপ করেছি বই কি! চোরের মত পরের সঙ্গে বাড়ী থেকে, মায়ের কোল থেকে পালিয়ে এসে পাপ করেছি বই কি!—খুব পাপের কাজ করেছি—মহাপাপ করেছি। বিধবা আমি—আমি মা ছেড়ে এসে পাপ করেছি বই কি! কিন্তু মাসি-মা, তার জন্য আমি কষ্টও বড় কম পাইনি—দুঃখও বড় কম পাইনি। আমি এখন পথের ভিখারিণী—আমি এখন কি, তা ত তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ। আমি পথের ধারে পড়ে মর্‌তে বসেছিলাম। স্ুধু কি তাই মাসি-মা! স্ুধু কি তাই? আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌তে গিয়াছিলাম;—গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কিন্তু মা-গঙ্গা আমার মত অভাগীকে নিলেন না। আমি বেঁচে উঠ্‌লাম। মাসি-মা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে—তাই বুঝি আমি বেঁচেছিলাম—তাই গঙ্গায় ডুবে গিয়েও আমার প্রাণ বাহির

হয় নাই। এখন ত তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। এখন আমি মরতে পারি—এখন আমি মরব। তুমি আমার জন্য—এই অভাগীর জন্য সব ছেড়ে কাশীতে থাকবে কেন? আমি তোমার কে? আমি যদি তোমাদেরই হ'তাম, তা হলে কি তোমাদের ছেড়ে এমন ক'রে চলে আসি? না, মাসি-মা, তুমি এখানে থাকতে পারবে না—তোমার কোলে মাথা রাখতে পেরেছি, এই আমার ঢের—এর বেশী আমি আর চাইনে—আর চাইতে পারিনে। তুমি যে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছ—তোমাদের এই কলঙ্কিনী মেয়েকে হাসিমুখে "সুশীলা" ব'লে ডেকেছ—"মা" ব'লে ডেকেছ, তাতেই আমি কৃতার্থ হ'য়ে গিয়েছি, মাসি-মা—কৃতার্থ——" সুশীলার দম্‌-বন্ধ হইয়া আসিল। এখনও তাহার শরীর সুস্থ হয় নাই,—এখনও সে বিছানায় বসিতে পারে না। তাহার উপর এই উত্তেজনা—এত কথা! সুশীলার মাথা ঘুরিয়া গেল—সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। বড়দিদিও যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন। সুশীলা যখন ক্রমে উত্তেজিত হইতেছিল, তখন যে তাহাকে নিরস্ত করা উচিত ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাধা দিতেও পারিলেন না।

সুশীলা যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন বড়দিদির হুস হইল। তিনি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনকড়ি সেই সময়েই বাসায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বড়দিদির চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলা বড়দিদির ক্রোড়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনকড়ি ব্যস্তভাবে বলিল "বড়দিদি, কি হয়েছে? সুশীলা আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল কেন?"

বড়দিদি বলিলেন "তিনু, সুশীলার মুখেচোখে একটু জল ছিটিয়ে দে ত ভাই! আমি ত ওকে কোলথেকে নামাতে পারছিনে।"

তিনকড়ি তখন সুশীলার মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। একটু পরেই সুশীলার চেতনাসঞ্চার হইল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল "মাগো—মা!"

বড়দিদি বলিলেন "কি—মা, এই যে আমি তোমাকে কোলে ক'রে বসে আছি মা! ভয় কি? তুমি কথা বোলো না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক।" তিনকড়ির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "সুশীলা কথা বল্‌তে বল্‌তে যেন কেমন হ'য়ে গেল। আমি যদি তখন ওকে কথা বল্‌তে নিষেধ করতাম, তা হলে আর

এমন হ'ত না। আমিও যেন কেমন হ'য়ে গেলাম। কথা বল্‌তে বল্‌তে ওর দম আট্‌কে এল। এই দুর্ব্বল শরীর! এখন বেশী কথা বললে মূর্চ্ছা যাবেই ত?"

তিনকড়ি বলিল "এখন থেকে ওকে বেশী কথা বল্‌তে দিও না।"

সুশীলা কাতরস্বরে ধীরে ধীরে বলিল "মাসি-মা, আমি ত আর বাঁচব না। মরবার আগে তোমাকে সব কথা বল্‌তে ইচ্ছা করছে।"

বড়দিদি বলিলেন "চুপ কর, মা আমার! বেশী কথা বল্‌লে তুমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তুমি সেরে ওঠ; তোমার শরীরে বল হোক; তখন তোমার কথা শুন্‌ব। লক্ষ্মী মা আমার, এখন একটু ঘুমোও। এখন আর কথা বোলো না!"

সুশীলা চুপ করিল। উত্তেজনায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একটু পরেই সে নিদ্রিত হইল।

তিনচারি দিন কাটিয়া গেল। বড়দিদি সুশীলাকে বেশী কথা বলিতে দিতেন না; সে কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিলেই বড়দিদি হয় তাহাকে থামাইয়া দিতেন, অথবা সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেন। এবার সুশীলা যেন ক্রমেই দুর্ব্বল

হইয়া পড়িতে লাগিল। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তিনকড়ি একদিন ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বাবু সুশীলাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি তিনকড়িকে ডাকিয়া বলিলেন "মেয়েটির অবস্থা পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহাতে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সে শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে ; কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। প্রথম হইতে যেভাবে ভাল হইতেছিল, এখন ত তাহা হইতেছে না ; বরঞ্চ আমি শেষ যে দিন দেখিয়া গিয়াছিলাম, তখন যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা হইতে অবস্থা খারাপ হইয়াছে। শরীরে রক্তের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আমি ঔষধ লিখিয়া দিয়া যাইতেছি ; যথারীতি ঔষধ খাওয়াইও। আপাততঃ দশপনর দিন কোন ভয়ই নেই। তবে কোন দুর্লক্ষণ দেখিলে তখনই আমাকে সংবাদ দিও।" এই বলিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, আর রক্ষা নাই।

সেই সময় বড়দিদি বাহিরে আসিয়া দেখেন তিনকড়ি

বিষণ্ণমুখে, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। তিনি নিকটে আসিতেই তিনকড়ি কাঁদিয়া উঠিল। বড়দিদি তাড়াতাড়ি তাহার নিকট বসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনকড়ি, কি হয়েছে? তুই কাঁদছিস্ কেন? ডাক্তার কি ব'লে গেলেন?"

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি, সুশীলাকে আর বাঁচাতে পারলাম না।"

বড়দিদি এই কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুশীলার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া বসিলেন।

সুশীলা বড়দিদির মলিনমুখ দেখিয়া বলিল "মাসি-মা, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি কাতর হচ্চ কেন? আমি ত তোমাকে বলেছি, এবার আমি বাঁচব না। আমার মরণই ভাল, আমার আর বেশীদিন বিলম্ব নেই। মাসি-মা, তুমি আমাকে নিষেধ কোরো না। আমি আজ তোমাকে আমার দুঃখের কথাগুলো বলি। এর পরে হয় ত আর বল্‌বার সময় পাব না।"

বড়দিদি তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সে কিছুতেই সে কথা শুনিল না। সে তখন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিল,—কলিকাতা হইতে পলায়নের পরামর্শ হইতে

আরম্ভ করিয়া, যে দিন পথের পার্শ্বে তাঁহারা তাহাকে মৃতকল্প অবস্থায় পান, সেই দিন পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত কথা সুশীলা ধীরে ধীরে বড়দিদিকে বলিল। বড়দিদির চক্ষু-দ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। অবশেষে সুশীলা বলিল "মাসি-মা, সব কথা ত শুন্‌লে, এখন বল আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে কি না? আমার মনে যে একটু পাপ স্পর্শ করেছিল, তার আর সন্দেহ নেই; তা আমি খুব স্বীকার করছি; কিন্তু আমি ত আর কোন অপরাধ করি নাই—বাবা বিশ্বনাথ ত আমাকে আর নামতে দেন নাই। না বুঝতে পেরে একটা ভুল আমি করেছিলাম—তার জন্য শাস্তিও ভোগ করেছি;—তার জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি—এতেও কি তোমরা আমাকে ক্ষমা কর্‌বে না? আমার মন একটু চঞ্চল হয়েছিল; কিন্তু আমি তা সাম্‌লে নিয়েছিলাম।"

বড়দিদি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি একটু স্থির হইয়া বলিলেন "সুশীলা, মা আমার, তুমি বড়ই ভুল করেছিল। তুমি ছেলেমানুষের মত একটা কাজ করেছিলে, এই তোমার দোষ হয়েছিল। তারই জন্য এ সব শাস্তি!" এই বলিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুশীলা বলিল "মাসি-মা, আমার জন্য কেঁদ না। তোমার চক্ষের জলে আমার সব পাপ ধুয়ে গেল—আমি নিষ্পাপ হয়ে গেলাম। আর আমার মর্‌তে ভয় নেই। কিন্তু মাসি-মা, আমার—" এই বলিয়াই সুশীলা চুপ করিল।

বড়দিদি বলিলেন "সুশীলা, চুপ কর্‌লে যে ? কি বল্‌তে চাচ্ছিলে বল ?"

সুশীলা বলিল "মাসি-মা, মাকে আর বাবাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। বাবা—বাবা গো"" সুশীলা নীরব হইল।

বড়দিদি বলিলেন "তার জন্য ভাবনা কি ! আমি তার ব্যবস্থা করছি। তুমি আজ অনেক কথা বলেছ মা! একটু ঘুমোও। আমি তোমাকে বাতাস করছি।" এই বলিয়া বড়দিদি তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। একটু পরেই সুশীলা ঘুমাইয়া পড়িল।

বড়দিদি তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনকড়িকে ডাকিয়া সুশীলার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনকড়ি বলিল "তার আর ভাবনা কি ! সাজাহানপুরে সতীশ বাবুকে টেলিগ্রাম করে দিই। তিনি এ সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই সুশীলার মাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন। আর তুমি না সেদিন বল্‌ছিলে যে, সুশীলার বাপেরও খালাসের সময় হয়ে এসেছে ; দুইচারি

দিনের মধ্যে তিনি খালাস হবেন। সতীশ বাবু এখানে এসে সুশীলার বাপের আস্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌তে পার্‌বেন।"

বড়দিদি বলিলেন "সুশীলার মাকে আমি যতদূর চিন্‌তে পেরেছি, তাতে আমার মনে হয়, সে আসবে না। সে তেমন মেয়েই নয়। সেই কল্‌কাতা থেকে যাবার দিন কি বলেছিল, মনে আছে? তার পর এতদিনের মধ্যে কত চিঠি তার পেয়েছি; কিন্তু কোনদিন সে মেয়ের নামটিও করে নাই। তিনকড়ি, সে কিছুতেই আস্‌বে না।"

তিনকড়ি বলিল "এ হ'তেই পারে না। মায়ের প্রাণ এত কঠিন হ'তেই পারে না, বড়দিদি! মেয়ে কুপথে গিয়েছে, মেয়ের ধর্ম্মনষ্ট হয়েছে, তা স্বীকার করি; কিন্তু তাই ব'লে কি মা কোন দিন মেয়ের উপর এমন নির্দ্দয় হ'তে পারে? কিছুতেই না—কিছুতেই না।"

বড়দিদি বলিলেন "তিনকড়ি, সুশীলার কাছে আমি সব কথা শুনেছি। তার ধর্ম্ম ঠিক আছে। সুধু ঠিক কেন বলি; সে তার ধর্ম্মরক্ষার, তার সতীত্বরক্ষার জন্য যা করেছে, যে কষ্ট সহ্য করেছে, তা খুব কম স্ত্রীলোকেই পারে।" এই বলিয়া অতি সংক্ষেপে তিনি সুশীলার সমস্ত কথা তিনকড়িকে বলিলেন।

বড়দিদির কথা শেষ হইলে তিনকড়ি বলিল "সব কথা যদি লিখে জানান যায়, তাহলে সুশীলার মায়ের আস্তে কোন আপত্তিই হবে না। দিদি, আমি এখনই টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে আসি।"

বড়দিদি বলিলেন "না, তিনকড়ি, সুশীলার মাকে খবর দিলে কিছুই হবে না—সে আস্বে না। আমি বল্‌ছি সে আস্বে না। সে তেমন মেয়ে নয়। আমি বলি কি, আমরা সুশীলাকে নিয়ে সাজাহানপুর যাই। সুশীলা ত বাঁচ-বেই না—তার মরণ নিশ্চিত। ওকে ওর মার কাছে নিয়ে যাই। সে যদি ওকে ক্ষমা ক'রে কোলে তুলে নেয়, তা হ'লে হয় ত, ত আরও দুদশ দিন বেঁচে থেকে মায়ের কোলে মরবে; আর সে যদি ওকে না নেয়, তাহ'লে না হয় তখনই মরবে—ওর সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। আমার ত মনে হয়, সুশীলাকে নিয়ে সাজাহানপুরে গেলে, ওর অবস্থা দেখে এবং সমস্ত কথা কথা শুনে, ওর মা ক্ষমা করতেও পারে; কিন্তু এখান থেকে খবর দিলে সে আস্বে না; সুশীলারও শেষ-ইচ্ছা আমরা পূর্ণ ক'রতে পারব না। এখন কথা হচ্চে এই যে, ডাক্তার ওকে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেবেন কি না, পথের মধ্যে

কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে কি না। এই কথাটা ডাক্তা-রকে জিজ্ঞাসা ক'রে আস্তে পারবি। ডাক্তার যদি বলেন, তাহ'লে কালই আমরা যাত্রা করতে পারি।"

তিনকড়ি তখনই, সেই সন্ধ্যার সময়ই ডাক্তারের নিকট গেল। সুশীলাকে সাজাহানপুরে লইয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন "তা নিয়ে যেতে পার। তবে খুব সাব-ধানে নিয়ে যেও। দুচার দিনের মধ্যে কিছু হচ্চে না; সে ভয় নাই। হয় ত সেখানে গেলে ভালও হ'তে পারে;—তবে সে আশা বড় নেই।"

সেই রাত্রিতেই সমস্ত ঠিক করা হইল। তিনকড়ি বাসা ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত মিটাইয়া দিল। বেলা দশটার সময় সাজা-হানপুর যাইবার রেলগাড়ী কাশীতে আসে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই বড়দিদি সুশীলাকে বলিলেন "সুশীলা, ডাক্তার বাবু তোমাকে নিয়ে স্থানান্তরে যেতে বলেছেন; তা হ'লে তোমার রোগ ভাল হবে; কাশীতে তোমার থাকা উচিত নয়। তাই তোমাকে নিয়ে আজ এই দশটার গাড়ীতে আমরা আরও পশ্চিমে যাব।"

সুশীলা বলিল "আরও পশ্চিমে কোথায় মাসি-মা?"

কথাটা গোপন করা অনাবশ্যক মনে করিয়া বড়দিদি বলিলেন "তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র সুশীলা যেন কেমন হইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "না মাসি-মা; সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আমি মাকে দেখ্‌তে চাইনে—আমি মায়ের কাছে যেতে পারব না। ওগো, আমাকে আর কষ্ট দিও না—আমাকে এখানেই মরতে দাও। আমি মায়ের মুখের দিকে চাইতে পারব না; মা আমাকে ক্ষমা করবেন না। মাসি-মা, তোমরা আমার মাকে জান না, আমার মা আমার মত এমন মেয়েকে দূর ক'রে দেবেন। আমার দিকে ফিরেও চাইবেন না। আমি যে তাঁকে ছেড়ে এসেছি মাসি-মা! আমি যে তাঁকে ছেড়ে এসেছি!"

বড়দিদি বলিলেন, "তুমি কিছু চিন্তা করো না সুশীলা! তোমার মা তোমার জন্য দিনরাত কাঁদে। আমাকে সে কত চিঠি লিখেছে।' তোমাকে তার কোলে তুলে দেবই। তুমি আপত্তি করো না; আমার কথা শোন।"

তিনকড়ি বলিল "সুশীলা, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার মা সব কথা শুন্‌লে তোমাকে নিশ্চয়ই কোলে টেনে

নেবেন—আমি বল্‌ছি নেবেন। তুমি ত কোন অপরাধই কর নাই যে, তিনি তোমাকে ফেলে দেবেন?”

বড়দিদি বলিলেন “অপরাধের কথা যদি বল, তা হলে সুশীলা অপরাধ করেছে বই কি? তবে সে কুপথে যায় নাই, সে তার ধর্ম্মরক্ষা করেছে, আর সে তার অন্যায় কার্য্যের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তা খুব হ’য়েছে। তবুও সে যে অপরাধ করেছে—হিন্দুর বিধবা হয়ে, সে যে পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে এসেছিল,—এ কি কম অপরাধ? তার মন যে চঞ্চল হয়েছিল, এ কথা ঠিক; কিন্তু সে জন্যই যে সে পালিয়েছিল, তা আমার মনে হয় না—সেটা ওর ছেলেমানুষী। কিন্তু তাই ব’লে, ও যে অপরাধ করে নাই, এ কথা আমি কিছুতেই বল্‌তে পারব না। আমরা হিন্দুর বিধবা; আমরা যদি একদণ্ডের জন্য ভুলেও কোন পাপ-কল্পনা বা কোন লালসাকে মনে স্থান দিই, তা হলেই আমাদের পরকালে নরক নিশ্চিত – তার জন্য আমাদের যে কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা এই সুশীলাতেই তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ। সুশীলাকে আমি কোলে তুলে নিয়েছি, তার কারণ এই যে, সুশীলা ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করেছে; তার হৃদয় থেকে সব ময়লা কেটে গিয়েছে, তাকে এখন মাথায় ক’রে রাখ্‌তে হবে।”

স্থশীলার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "স্থশীলা, তুমি মনে কিছু কোরো না; ভেবে দেখ, আমি যা বল্লাম, তা ঠিক কি না। হিন্দুর বিধবাকে কি কর্‌তে হয়, বিধবা মাত্রেরই কি করা কর্ত্তব্য, তা তুমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছ। একটু লালসাকে মনে স্থান দিয়েছিলে, তারই জন্য দেখ্‌লে, তোমার অদৃষ্টে কি হোলো, তুমি কত কষ্ট পেলে। এমনই ক'রেই অনেকে পাপে ডুবে যায়। তোমার সৌভাগ্য, তোমার কর্ম্মের জোর ছিল, তাই তুমি এমন কেটে উঠেছ, এমন খাঁটি হয়েছ। এত পোড়ো না খেলে তোমার অদৃষ্টে কি হোতো, তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন। যাক্ সে কথা; তুমি সাজাহানপুরে যেতে অস্বীকার কোরো না। আমি যা করছি, তোমার ভালর জন্যই করছি। আমার কথা তুমি শোন; আর নির্ভর কর সেই বাবা বিশ্বনাথের উপর।"

তিনকড়ি বলিল "যাক্ ও কথায় আর কাজ নেই। এখন যাবার সব ঠিক ক'রে ফেলা যাক। স্থশীলার রেলে খাবার জন্য কি কি নিতে হবে, তা সব ঠিক ক'রে নেও বড়দিদি! তোমার এবার আর বিশ্বনাথ দর্শন হোলো না!"

বড়দিদি বলিলেন "বিশ্বনাথ দর্শন হোলো না, তুই বল্‌ছিস তিনু! আমি স্থশীলার পাশে ব'সে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বিশ্বনাথ,

অন্নপূর্ণা দর্শন করেছি, তা তুই জানিস্। বিশ্বনাথ যদি কৃপা না করতেন, তা হলে কি সুশীলাকে পেতি ; বিশ্বনাথ যদি দিন-রাত এখানে দাঁড়িয়ে না থাক্‌তেন, তা হইলে কি তুই সুশীলাকে বাঁচাতে পারতি—তা না হলে কি সুশীলা এমন হ'তে পারত। তিনিই ওকে এখানে রক্ষা করেছেন, তিনিই ওকে আজ ওর মাকে দেখ্‌তে পাঠাচ্ছেন ; তুই আমি ত নিমিত্তমাত্র।"

সুশীলা তখন করযোড়ে বলিয়া উঠিল "বাবা বিশ্বনাথ—বাবা—বাবা" তাহার পর সে আর কোন কথা বলিল না, কোন আপত্তি করিল না। তাহার সেই কাতর-আহ্বান শুনিয়া পতিতপাবন বিশ্বনাথ হয় ত তাহাকে মাতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন ; নতুবা সে সহসা এমন করিয়া চুপ করিবে কেন ?

তাহারা বেলা দশটার সময় কাশী ষ্টেসনে সাজাহানপুরের টিকিট কিনিয়া তৃতীয়-শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিল! ঘটনাক্রমে ঠিক সেই গাড়ীরই একটা দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরার আরোহী—সতীশ ও দীনেশ। দুই দলই একই গাড়ীতে পরস্পরের অজ্ঞাতে সাজাহানপুর যাইতেছে।—বিধাতার বিধান !

[৩২]

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় সাজাহানপুরে গাড়ী পৌঁছিল। সতীশ পূর্ব্বেই তার করিয়াছিল; তাহার জন্য ঘরের-গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়াছিল, বাড়ার চাকরও আসিয়াছিল। তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া আর বিলম্ব করিল না; জিনিষপত্র লইয়া গাড়াতে উঠিল। তাহারা কি করিয়া জানিতে পারিবে যে, সেই গাড়ীতেই সুশীলারা আসিতেছে।

এদিকে গাড়ী সাজাহানপুরে পৌঁছিলে তিনকড়ি ও বড়দিদি প্রথমে তাঁহাদের সামান্য জিনিষপত্র নামাইলেন; তাহার পর বিশেষ সাবধানে সুশীলাকে গাড়ী হইতে প্ল্যাটফরমে নামাইয়া তাঁহাদের সতরঞ্চখানি বিছাইয়া এবং একটা কাপড়ের গাঁটরী তাহার পার্শ্বে দিয়া সুশীলাকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর তিনকড়ি টিকিট দিবার স্থানে গেল। সেখানে যাইয়া সে দেখিল যে, একটি বাঙ্গালিবাবু টিকিট লইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার সাহস হইল, কারণ তাহার ভয় হইয়াছিল, ষ্টেসনের লোকেরা হয় ত তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ষ্টেসনের বাহিরে মুসাফিরখানায় যাইতে আদেশ করিবে।

২৮৯]

সুশীলাকে একটু সুস্থ না করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে হয় ত সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িবে; এই কথা ভাবিয়াই তিনকড়ি কোন একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য টিকিট-দিবার গেটের নিকট গিয়াছিল। বাঙ্গালী টিকিট-কলেক্টরকে দেখিয়া সে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন আর সকল যাত্রী বাহির হইয়া গেল, তখন সে টিকিট-কলেক্টরের নিকট যাইয়া বলিল "মহাশয়, আমরা বড বিপদে পড়িয়াছি। আমরা বাঙ্গালী; কাশী হইতে আসিতেছি। আমার সঙ্গে আমার ভগিনী আছেন, আর একটি ভাগিনেয়ী আছেন। ভাগিনেয়ীটির বড অসুখ। তাঁকে প্ল্যাটফরমের ঐ দিকে শোয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আপনি বাঙ্গালী, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার করা হয়।"

টিকিট-কলেক্টর বলিলেন "বলুন, আমাকে কি করতে হবে। আপনাদের টিকিট কয়খানি আগে দিন।"

তিনকড়ি তিনখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "আমরা এখানে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিলের বাসায় যাব।"

এই কথা শুনিয়াই টিকিট-কলেক্টর বলিলেন "আপনারা সতীশ বাবুর বাড়ীতে যাবেন ? সতীশ বাবু যে এই গাড়ীতেই কলিকাতা থেকে এলেন। তাঁর গাড়ী ষ্টেসনে এসেছিল। এই দুতিন মিনিট হোলো তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসি, তাঁরা চলে গিয়েছেন কি না।"

একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন "না, তাঁরা চ'লে গেছেন। আপনারা কি আগে খবর পাঠান নেই।"

তিনকড়ি বলিল, "না, খবর পাঠাবার সুবিধা হয় নাই।"

টিকিট-কলেক্টর বাবু বলিলেন "তা হলে চলুন, আগে দেখি আপনার রোগী এইটুকু চ'লে বাহিরে যেতে পারবেন কি না; তারপরে আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি তিনকড়ির সহিত প্ল্যাট্‌ফরমে যেখানে বড়দিদি ও সুশীলা ছিলেন, সেইস্থানে গেলেন।

তিনকড়ি বড়দিদিকে বলিলেন, "বড়দিদি, ইনি এখানকার টিকিট-বাবু; ইনি আমাদের দেশের লোক। ইনি সতীশ বাবুকে জানেন। ইনি আমাদের তাঁর বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার

বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। ইনি বল্‌ছিলেন, সতীশ বাবু এই গাড়ী-তেই কল্‌কাতা থেকে এলেন। আমরা ত আর তা জানিনে। তিনি নেমেই তাঁর ঘরের-গাড়ীতে চ'লে গিয়েছেন।"

টিকিট-কলেক্টর বলিলেন "তা, আপনাদের কোন অসু-বিধা হবে না। আমি গাড়ী ঠিক ক'রে দিচ্ছি। এখন আমার ষ্টেসনে কাজ আছে, নইলে আমিই আপনাদের সঙ্গে ক'রে সতীশ বাবুর বাড়ীতে রেখে আস্‌তাম। আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দেব এখন। তারপর কথা হচ্ছে, উনি কি এইটুকু চলে যেতে পারবেন না? গেট পর্য্যন্ত না হয় না গেলেন, আফিস-ঘরের ভিতর দিয়েই ওঁকে নিয়ে যাব।"

তিনকড়ি বলিল, "সেইটেই ত ভয় করছি! এখানে পাল্‌কী পাওয়া যায় না?"

টিকিট-কলেক্টর্ বলিলেন, "না, ষ্টেসনের কাছে পাল্কীর আড্ডা নেই। পাল্কী আনিয়ে দিতে পারি; কিন্তু আধঘণ্টার উপর দেরী হ'তে পারে। এদিকে রাতও হয়ে যাচ্চে। তা, আমি বলি কি, একখানা ইজি-চেয়ারে ওঁকে বসিয়ে নিয়ে গাড়ীতে চড়িয়ে দিলে কোন কষ্ট হবে না।"

তিনকড়ি বলিল, "তা, বেশ হবে! আপনাকে আমরা বড় কষ্ট দিচ্ছি!"

টিকিট-কলেক্টর বলিলেন, "বলেন কি? কষ্ট কি? আপনারা আমার দেশের লোক; আপনাদের সাহায্য করা ত আমার কর্ত্তব্য। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন; আমি একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে আসি; আর জনকয়েক কুলী, আর একখান ইজি-চেয়ার নিয়ে আসি।" এই কথা বলিয়াই টিকিট-কলেক্টর বাবু চলিয়া গেলেন এবং একটু পরেই চারিজন কুলীকে দিয়া একখানা ইজি-চেয়ার লইয়া আসিলেন। তখন তিনকড়ি ও বড়দিদি সুশীলাকে সেই চেয়ারে বসাইবার জন্য তাহাকে ডাকিল।

সুশীলা এতক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় শয়ন করিয়াছিল; বড়দিদির ডাক শুনিয়া সে বলিল, "মাসি মা, আমাকে ডাক্‌ছ?"

বড়দিদি বলিলেন "হ্যাঁ মা, এখন আমরা সতীশ বাবুর বাড়ীতে যাব। তুমি ত ষ্টেসনের বাহির পর্য্যন্ত চ'লে যেতে পার্‌বে না, তাই এই বাবুটি দয়া ক'রে তোমাকে গাড়ীতে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। রাত হ'য়ে যাচ্ছে, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।"

সুশীলা বলিল, "মাসি-মা, সেখানে না গেলে কি হয় না? আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে। সেখানে গেলে হয় ত আমি বাঁচব না। মরতে আমার ভয় নেই—তবে সেখানে গিয়ে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া তিনকড়ি বলিল, "না, না, তুমি ওঠ সুশীলা!"

সুশীলা একবার তিনকড়ির দিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সে কাতরস্বরে বলিল, "তিনকড়ি-মামা, আমি এটুকু হেঁটেই যেতে পারব। আমি মাসি-মার গায়ের উপর ভর দিয়ে বেশ যেতে পারব।"

টিকিট-কলেক্টর বাবু বলিলেন, "না, না, তা কি হয়! ওঁকে যে রকম দুর্ব্বল দেখ্‌ছি, তাতে চল্‌তে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে!"

সুশীলা তখন আর প্রতিবাদ করিল না। বড়দিদি ও তিনকড়ি তাহাকে অতি সন্তর্পণে চেয়ারে বসাইয়া দিল। তাহার পর কুলীরা সেই চেয়ারখানি বাহিরে লইয়া সুশীলাকে গাড়ীর মধ্যে বসাইয়া দিল। টিকিট-কলেক্টর বাবু একজন

লোককে কোচবাক্সে বসাইয়া দিলেন; সে সতীশ বাবু উকিলের বাড়ী চিনিত।

তিনকড়ি তখন পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, "মশাই, কুলীদের কত দিতে হবে?"

টিকিট-কলেক্টর বলিলেন "কুলীদের আবার কি দিতে হবে! ওরা ষ্টেসনের কুলী; ওদের কিছুই দিতে হবে না। আপনি গাড়ীতে উঠে বসুন। যদি সুবিধা হয়, তা হ'লে মেয়েটি কেমন থাকেন, এ খবরটা কা'ল আমাকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। আর আমি যদি পারি, তা হ'লে কা'ল না হয় একবার সতীশ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে আপনাদের খোঁজ নিয়ে আসব; সতীশ বাবুর সঙ্গে অনেক জানাশোনা আছে।"

তিনকড়ি তখন টিকিট-কলেক্টর বাবুকে ধন্যবাদ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ধীরে ধীরে সতীশ বাবুর বাড়ীর দিকে চলিল।

[৩৩]

রেলগাড়ী সাজাহানপুর ষ্টেসনে পৌছিলেই সতীশের সহিস ও চাকর দৌড়িয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। প্রথমে সতীশ ও দীনেশ গাড়ী হইতে নামিল; তাহার পর চাকর ও সহিস গাড়ীর মধ্য হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া কতক নিজেরা লইল এবং কতক দুইটা কুলীর মাথায় তুলিয়া দিল। তাহারা তখন ষ্টেসনের বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল।

এই দুইদিন সতীশ দীনেশের কাছে অবিশ্রান্ত মিথ্যা-কথা বলিয়া আসিযাছে। আর একটু পরেই সে মিথ্যাও শেষ হইয়া যাইবে, আর একটু পরেই দীনেশের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন দীনেশের অবস্থা কি হইবে, ইহা ভাবিয়াই সতীশের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তাহার মুখ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায় ভগবান্, হতভাগ্যের অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলে!" তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

দীনেশ অন্ধকারে সতীশের মুখ দেখিতে পায় নাই; কিন্তু

তাহাকে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দীনেশ বলিল "সতীশ, তুমি যে একেবারে কথাটীও বল্‌ছ না।"

সতীশ কাতরকণ্ঠে বলিল "হু'দিনের গাড়ীর ঝাঁকুনিতে শরীরটা যেন কেমন করছে; মাথাটা ঘুরছে। কথা বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

দীনেশ তাহাই বুঝিল; সে বলিল "আহা, তা হবে না। তোমাব ত আর ঘুরে বেড়ান অভ্যাস নেই। আমার জন্য তোমাকে কত কষ্টই কর্‌তে হলো সতীশ!"

সতীশ এ কথার আর কোন উত্তর দিল না। দীনেশও আর কোন কথা বলিল না।

একটু পরেই গাড়ীখানি সতীশের বাগানের গেট অতিক্রম করিল। সতীশ যে তখন কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। গাড়ী সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সতীশ তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং দীনেশকে কিছু না বলিয়া বরাবর বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল; বৈঠকখানাঘরে সে প্রবেশ করিল না! দীনেশ মনে করিল, তাহাদের আগমন-সংবাদ তাহার স্ত্রী ও সুশীলাকে দিবার জন্যই সতীশ তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। দীনেশ তখন গাড়ী হইতে নামিল;

চাকরেরা জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল। একজন চাকর দীনেশকে বলিল "বাবু, আপনি এসে বৈঠকখানায় বসুন। ওরা সব চিজ ঠিক করুকে লেগা।"

দীনেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বৈঠকখানার ভিতর একপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার ও একটা টেবিল ছিল। টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছিল; আর একদিকে কয়েকখানি তক্তপোষ জোড়া দিয়া তাহার উপর একটা বড় ফরাস ছিল। দীনেশ ফরাসে না বসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। ঘরের মধ্যে যে চাকর ছিল, সে পূর্ব্ববন্দোবস্তমত তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

বৈঠকখানার পিছনদিকেই একটা দ্বার ছিল। দীনেশ পূর্ব্বে যেবার আসিয়াছিল, সেবার ঐ দ্বার দিয়াই সে বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গিয়াছিল। দীনেশ সতৃষ্ণনয়নে সেই দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল—ঐ পথেই যে সুশীলা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইবে! কিন্তু কৈ, সুশীলা ত আসে না! সুশীলা কি সংবাদ পায় নাই? না, তাহা হইতেই পারে না; সতীশ ত পৌঁছিবা-মাত্রই বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। তবে সুশীলার আসিতে

এত বিলম্ব হইতেছে কেন? আজ দুই বৎসর যে সে তাহার মুখখানি দেখে নাই! কৈ, সুশীলা ত এখনও আসে না! তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, হয় ত সুশীলা অসুস্থ; তাই সে আসিতে পারিতেছে না; আর সেই জন্যই হয় ত সতীশেরও বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই সে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া যায় এবং সুশীলাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করে।

তাহাকে এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না; ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী দৌড়িয়া আসিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো —সুশীলা—"

তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দীনেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি হইয়াছে, ব্যাপার কি, সে ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। পদতলে পড়িয়া তাহার অভাগী পত্নী মনোরমা। দীনেশ তাড়াতাড়ি মনোরমাকে তুলিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু কি সে জিজ্ঞাসা করিবে? প্রাণপণ শক্তিতে দীনেশ কথা বলিবার চেষ্টা করিল; কথা তাহার মুখ

দিয়া বাহির হইল না। সে মনোরমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বারের অপর পার্শ্বেই দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন ;—একজন সতীশের স্ত্রী, অপরটি সতীশের কন্যা রাণী। দীনেশ ও তাহার স্ত্রী কেহই কিছু বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া, সতীশের স্ত্রী মেয়েটিকে বৈঠকখানার মধ্যে ঠেলিয়া দিল। রাণী কি করিবে ? মায়ের আদেশ ! সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দীনেশের স্ত্রীর হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল "জ্যাঠাই-মা, ও জ্যাঠাই-মা !"

এইবার দীনেশের কথা ফুটিল ; সে রাণীর দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল "মা, আমার সুশীলা।"

এই প্রশ্নে রাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; অতিকষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "জ্যাঠামশাই, সুশী দিদি নেই গো—নেই—নেই।" এই বলিয়া সে তাহার জ্যাঠাইমার হাত ছাড়িয়া দিয়া দীনেশের কোলের কাছে গেল। মনোরমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। দীনেশের হস্তপদ অসাড় হইয়া গিয়াছিল ; সে তাহার অভাগী স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। রাণী তাহার গলা জড়াইয়া

ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সতীশের স্ত্রী আর দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; তখন তাঁহার লজ্জা করিবার সময় ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোরমার মস্তক কোলে তুলিয়া বসিলেন। সতীশও সেই সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

সতীশকে দেখিয়া দীনেশের কথা বলিবার শক্তি আসিল; সে কম্পিতস্বরে বলিল "সতীশ, ভাই—সুশীলা নেই!"

সতীশ বাড়ীর মধ্য হইতে হৃদয় দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, এ সময়ে সে যদি দৃঢ় না হয়, সে যদি আত্মহারা হয়, তাহা হইলে চলিবে না। তাই সে অতি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল "এই ত তোমার সুশীলা—একেই তোমার মেয়ে বলিয়া কোলে কর। তার কথা আর বলো না!"

এ কি কথা? সতীশ বলে কি? সতীশের স্বর এত কর্কশ কেন? দীনেশ তখন রাণীকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছে; তাহার দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না।

সতীশের কথা শুনিয়া দীনেশ তাহার মুখের দিকে কাতর-নয়নে চাহিল। সতীশ কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল, সে

আজ আর কাহাকেও দয়া করিবে না, সে আজ একেবারে বজ্রনিক্ষেপ করিবে। সতীশ দীনেশের দিকে চাহিয়া তেমনই কর্কশস্বরে বলিল "দীনেশ, তোমার সে কলঙ্কিনী মেয়ের কথা ভুলিয়া যাও। সুশীলা বলিয়া তোমার কোন মেয়ে ছিল না—নাই। তার কথা মন থেকে মুছে ফেল। যে আমাদের মুখের দিকে না চেয়ে, ধর্ম্মের দিকে না চেয়ে, ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে, সে আমাদের মেয়ে নয়! সে তোমার ঔরসে, আর এই দেবীর গর্ভে কখনও জন্মেনি—কখনও জন্মেনি। তার জন্য আবার কাঁদতে হবে। বউদিদি! তুমি ও কি করছ? রাণী, তুই কাঁদছিস্ কেন? হিন্দু-গৃহস্থের বউ মেয়ে হ'য়ে তোমরা একটা কলঙ্কিনী, একটা ব্যভিচারিণীর জন্য কাতর হচ্ছ! বউদিদি! তুমিই না একদিন বলেছিলে, তোমার গর্ভে অসতী মেয়ে জন্মাতে পারে না! তোমার মেয়ে ম'রে গেছে। তবে আর আজ এমন অধীর হচ্ছ কেন?" সতীশ এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন কর্কশ কথা বলা যে তাহার স্বভাববিরুদ্ধ; সে যে কোন দিন রাগ করিয়া কোন কথা বলে নাই! আজ সে এমন ভাবে কথা বলিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; ফরাসের উপর মাথায় হাত দিয়া

বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কঠোরতা কোথায় চলিয়া গেল; সে বালকের মত 'হা হা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতীশের কথায় কাজ হইয়াছিল; তাহার সেই কর্কশ, সত্যকথায় দীনেশের স্ত্রী মনোরমা নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, তাহা তখন চলিয়া গেল। তিনি তখন সতীশের স্ত্রীর কোল হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন; তাহার পর অতি কঠোরস্বরে বলিলেন "তুমি ঠিক বলেছ ঠাকুর-পো, ঠিক বলেছ! আমাদের কোন মেয়ে ছিল না—সুশীলা ব'লে আমাদের কেউ ছিল না—কখন ছিল না। ছিঃ, ছিঃ, যে বিধবা হয়ে ধর্ম্মরক্ষা করতে পারল না, যে চোরের মত বেরিয়ে গেল, সে কখনও আমার মেয়ে নয়। তার জন্য আবার দুঃখ কি? তার জন্য আবার কষ্ট কি? কিছু না। ওগো, তুমি মন বাঁধ। সব ভুলে যাও। এ সংসারে ঐ সতীশ বাবু আর এই লক্ষ্মী বৌটি, আর তোমার কোলের ঐ রাণী ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। এদের মুখের দিকে চাও; সে মুখ ভুলে যাও। চল বৌ, আমরা বাড়ীর মধ্যে যাই। রাণী, তুমি তোমার জেঠা-মহাশয়ের কাছে থাক।"

সতীশ বলিল "দীনেশকেও বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাও রাণী! ওর এখানে থেকে কাজ নেই। যাও, তোমরা সকলেই বাড়ীর মধ্যে যাও।"

দীনেশ এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। তাহার মাথায় যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছিল; সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল; যেন এ অভিনয়ের সে দর্শকমাত্র,—তাহার সঙ্গে যেন এ সকল ঘটনার কোন সম্বন্ধই নাই। সে যেন এদের কেহই নহে। তাহার বুকের ভিতরটা যেন অকস্মাৎ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এ বড় ভয়ানক অবস্থা! কাঁদিবার শক্তি নাই—কথা বলিবার সামর্থ্য নাই,—হাতখানি তুলিবারও বল নাই!

সতীশ দীনেশের এই অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইল; তাহার মনে হইল, দীনেশের হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। সে তখন দীনেশের নিকট যাইয়া বলিল "দীনেশ, তুমি একটু কাঁদ।"

এতক্ষণে দীনেশের সংজ্ঞা আসিল, সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিল "এ্যাঁ, একটু কাঁদ! কাঁদব—চোখে যে জল আসে না। আমি যে—।"

দীনেশের কথা অসমাপ্তই রহিল; বাহিরে বারান্দার

সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশ দ্বারের নিকট যাইয়া দেখিল, কে একজন যুবক গাড়ী হইতে নামিতেছে; গাড়ীর মধ্যে আর কেহ আছে কি না, অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া গেল না।

সতীশ বারান্দায় যাইতেই তিনকড়ি সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিয়া সতীশকে প্রণাম করিয়া বলিল "আমাকে চিন্‌তে পারছেন না? আমি তিনকড়ি মিত্র; কলিকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় আমার বাড়ী!"

সতীশ বলিল "চিন্‌তে পেরেছি। আপনি এমন সময় কোথা থেকে? গাড়ীতে কি আর কেউ আছে?"

তিনকড়ি বলিল "গাড়ীতে আমার বড়দিদি আছেন, আর"—কথাটা শেষ না করিয়াই তিনকড়ি চুপ করিল।

সতীশ সাগ্রহে বলিল "আপনার দিদি এসেছেন? ও রাণি! তোর জ্যাঠাইমাকে বল্, কল্‌কাতা থেকে তিনকড়ি বাবু আর তাঁর বড়দিদি এসেছেন।"

সতীশের কথা শেষ হইতে না হইতেই দীনেশের স্ত্রী মনোরমা বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাড়াতাড়ি গাড়ীর নিকট যাইয়া বলিলেন "বড়দিদি—তুমি!"

বড়দিদি গাড়ীর মধ্য হইতেই বলিলেন "হ্যাঁ আমিই এসেছি। আমি একলা নই বোন! আমার সঙ্গে সুশীলাও এসেছে।"

• সেই সময়ে সে স্থানে যদি বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মনোরমা অধিকতর চম্‌কাইয়া উঠিতেন না; তিনি বলিলেন "কি বল্‌ছ দিদি—কি, সুশীলা!"

বড়দিদি কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনকড়ি বলিল "হ্যাঁ, সুশীলা; সুশীলাকে আমরা নিয়ে এসেছি।"

কথাটা তিনকড়ি এত উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, ঘরের মধ্য হইতে দীনেশ, রাণী ও সতীশের স্ত্রী কথাটা শুনিতে পাইল। সতীশ বলিল "সুশীলা! আমাদের সুশীলা!"

দীনেশ ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিল; "সুশীলা—মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া গাড়ীর নিকট গেল। পার্শ্বেই তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি দীনেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "সুশীলা—সুশীলা ব'লে আমাদের কেউ নেই। তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাদের সুশীলা দুই বৎসর আগে ম'রে গিয়েছে।"

তিনকড়ি আর সহ্য করিতে পারিল না; সে গম্ভীরস্বরে

বলিল "না, সুশীলা এতদিন মরে নাই, আজ সে মরতে এসেছে। আমরা আজ তাকে এই শ্মশানে নিয়ে এসেছি। কোচম্যান্, গাড়ী ফিরাও!" এই বলিয়া তিনকড়ি রাগে ফুলিতে ফুলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে গেল। সতীশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "তিনকড়ি বাবু, ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তিনকড়ি তখন রাগিয়া গিয়াছিল; সে বলিল "আর কাউকে কিছু বুঝ্‌তে হবে না। সুশীলা মর্‌তে বসেছে। তার বড় ইচ্ছা হয়েছিল যে, একবার জন্মশোধ বাপ-মাকে দেখে। তাই সেই মরা-মেয়েকে বুকে ক'রে নিয়ে আমরা ভাইবোনে এখানে এসেছিলাম। এখন দেখ্‌ছি সুশীলা ত মরে গিয়েছে। আর কেন, আমরা অভাগীকে নিয়ে যাই। গাছতলায় তার প্রাণ বেরিয়ে যাক্, সেও ভাল—এখানে নয়।" এই বলিয়া সে সতীশের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গাড়ীর কাছে গেল; তাহার পর পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিল "সুশীলা, মা আমার, তোর মা মরে গেছে—তোর বাবা নেই। ও যাদের দেখ্‌ছিস্, ওরা ভূতপ্রেত—ওরা প্রেত। চল্ মা, চল্ অভাগী, তোকে এরা চেনে না—তুই

এদের কেউ না। বড়দিদি, আর কেন? চল, এখান থেকে চলে যাই।"

সতীশ দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া গেল; বড়দিদি যে গাড়ীর মধ্যে আছেন, তাহা সে একবারও ভাবিল না। সে সুশীলাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আয় মা, আমার ঘরে আয়। কে বলে তোর কেউ নেই! আর কেউ না থাকে, তোর কাকাবাবু আছে, তোর কাকীমা আছে।" সতীশ আর কথা বলিতে পারিল না। সে সুশীলাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তখন যেন তাহার শরীরে সিংহের ন্যায় বল আসিল। কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া সে সেই মৃতকল্প সুশীলাকে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং তাহাকে ফরাসের উপর শোয়াইয়া ডাকিল "সুশীলা—মা আমার!"

সুশীলা যখন সাড়া দিল না, চোক চাঁহিল না; তখন সতীশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পরই বলিয়া উঠিল "তোমরা দেখ্‌ছ কি? ও রাণী! ওরে রামভজন জল্‌দি পানি লাও—জল্‌দি লাও। শুকলাল, দৌড়কে ডাক্তার

সাহেবকো কুঠিমে যাও; আভি ডাক্তার সাহেবকো বোলায় লেও। জল্‌দি যাও। রাণী! শীগ্‌গির পাখা নিয়ে আয়। সুশীলা যে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। সুশীলা—সুশীলা, মা আমার!"

দীনেশ তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া সে সুশীলাকে বুকের মধ্যে লইতে গেল; সতীশ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "দীনেশ, ও কি করছ? আগে মাকে বাঁচাই, তার পর তুমি ওকে কোলে কোরো।"

তখন সতীশের স্ত্রী সুশীলার মুখেচোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল; বড়দিদি সুশীলার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন। রাণী বাতাস করিতে লাগিল; আর সুশীলার মাতা দূরে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে সুশীলার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তিনকড়ির তখনও রাগ যায় নাই। সে ঘরের মধ্যে আসিয়া একবার সুশীলার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পরেই বলিয়া উঠিল "বড়দিদি! আর দেখছ কি? মাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলাম, মেরে ফেল্‌লাম। মা কি আর আছে? তোমরা সকলে শোন, আপনিও শুনুন

সতীশ বাবু, মা আমার সতীলক্ষ্মী। বুদ্ধির ভুলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, এই তার যা অপরাধ। মা আমার তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। ওর শরীরে কোন পাপ নেই সতীশ বাবু! ও যে নিজের সতীত্বরক্ষার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছে, কত দুঃখ পেয়েছে, তা শুন্‌লে তোমরা ওর পায়ের ধূলো নেবে। সে সব কথা আর বোল্‌ব না—ব'লে কোনই লাভ নেই। মা ত নেই! বড়দিদি! কি করতে মাকে এতদূর নিয়ে এলাম দিদি!"

সুশীলা গাড়ীর মধ্য হইতে যখন তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল, তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণের শুশ্রূষায় তাহার চেতনাসঞ্চার হইল। সে একবার চাহিল। বড়দিদি বলিলেন "মা, সুশীলা?"

সুশীলা অতি ধীরে বলিল "মা—বাবা।"

মনোরমা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, সুশীলার বুকের উপর আসিয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা, মা সুশীলা—এই যে আমি।"

সুশীলা ডাকিল "বাবা।"

দীনেশ কাছেই বসিয়াছিল, সে বলিল "কি মা!"

সুশীলা অতি কাতরস্বরে বলিল "যাই মা—বাবা!" তাহার পরেই সব শেষ হইয়া গেল। অভাগী সুশীলার পবিত্র আত্মা বিশ্বজননীর কোলে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত।

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুস্তক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়ের লিখিত ঐতিহাসিক-উপন্যাস—'ধর্ম্মপাল' অতঃপর প্রকাশিত হইবে।